সতীর-স্বর্গ

(পারিবারিক উপন্যাস)

শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত

প্রকাশক
শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ
বরেন্দ্র লাইব্রেরী
২০৪।২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
আশ্বিন ১৩২৩

মূল্য ১।০ পাঁচসিকা মাত্র।

ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

স্নেহ ও প্রীতিময়ী শ্রীমতী সরযূবালা পাল,

শ্রীচরণকমলেষু।

বৌদিদি,

মায়ের আহ্বান সঙ্গীতে আজ শরতের শুভ্র-উষা ভরিয়া উঠিয়াছে। মহা-ষষ্ঠীর এই মহা শুভক্ষণে বঙ্গনারীর জন্মজন্মান্তরের চির আকাঙ্খা ও মহা গৌরবের সামগ্রী—স্বামীর-গৃহ "সতীর স্বর্গ" তোমারই চরণে অর্পিত হইল। দীন হীন ভগ্ন হইলেও "সতীর স্বর্গ" তোমার নিকট কি কখনও হতাদৃত হইতে পারে?—না। আমার এ ভক্তি-অর্ঘ তোমারই চরণে নির্ম্মাল্য হউক।

মহা-ষষ্ঠী
আশ্বিন ১৩২৩

যতীন।

সতীর-স্বর্গ

সমাজের অট্টহাসি ! দৈন্যের দীর্ঘশ্বাস !!

অপূর্ব্ব—সামাজিক—উপন্যাস

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত

বিয়ের ক'নে

(যন্ত্রস্থ)

সতীর-স্বর্গ

—※—

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া গোকুলকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেইরূপ বসুদিগের কর্ত্তা ভবশঙ্করের কাল হইবার পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অপূর্ব্ব তাঁহাদের জীর্ণ সংসারটি ধারণ করিয়া বহুকষ্টে তাহাকে ছন্নছাড়ার পথ হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। ভবশঙ্করের আয়ও যেরূপ ছিল, ব্যয়ও সেইরূপ ছিল, কাজেই মৃত্যুর সময় তিনি তাঁহার পুত্রদিগের জন্য বিশেষ কিছুই সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। ভব-শঙ্করের দুইটী পুত্র, অপূর্ব্ব ও অনুপম। অনুপম সংসারের কোন ধারই ধারিতেন না,—যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন, তাহাই আনিয়া সংসারে দিয়াই তিনি খালাস; সংসারের যাহা কিছু ঝক্কি তাহা জ্যেষ্ঠ অপূর্ব্বই মাথা পাতিয়া লইয়াছিলেন।

ভবশঙ্করের মৃত্যুর বহুপূর্ব্বেই অপূর্ব্বের বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু কনিষ্ঠ অনুপমের হয় নাই। না হইবার বিশেষ একটা কারণও ছিল,—অনুপম বিবাহ করিতে একেবারেই নারাজ ছিলেন। সংসারের গণ্ডগোলের ভিতর পড়িয়া পাছে জীবনের সুখ শান্তি নষ্ট হয়, সেই আশঙ্কায় তিনি সেকাজ হইতে সর্ব্বদাই নিজেকে তফাতে

রাখিতেন। শিবতুল্য ভবশঙ্কর পুত্রদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না; সেইজন্যই অনুপমের বিবাহটা এযাবৎ ঘটিয়া উঠে নাই। পাটের দালালি করিয়া অনুপম উপার্জ্জন করিতেন যথেষ্ট; কিন্তু টাকাটাকে ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতা তাঁহার একেবারেই ছিল না। টাকা যে কোন্ দিক দিয়া আসিত তাহাও তিনি যেমন জানিতে পারিতেন না; তেমনি আবার কোথা দিয়া কেমন করিয়া চলিয়া যাইত, তাহাও তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না।

যাহা ভবশঙ্কর পারেন নাই,—অপূর্ব্বের পত্নী সরোজবাসিনী তাহাই সম্পন্ন করিলেন,—তিনি অনুপমের বিবাহ দিলেন। অনুপম পৃথিবীতে সকলেরই অনুরোধ উপরোধ এড়াইতে পারিতেন; কিন্তু স্নেহময়ী বৌদিদির উপরোধ এড়াইবার ক্ষমতা তাঁহার কোন দিনই ছিল না। কাজে কাজেই তাঁহাকে হার মানিতে হইল,—বৌদিদির অনুরোধ তিনি আদেশের ন্যায় মাথা পাতিয়া লইতেন। অনুপম যে বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করেন, সে কথা সহরের কাহারও অবিদিত ছিল না। সেইজন্য সরোজবাসিনীর বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল না,—তিনি অবিলম্বেই এক ধনীর কন্যার সহিত দেবরের বিবাহ স্থির করিয়া ফেলিলেন। এক শুভ দিনে, শুভ লগ্নে, মহা ধুমধামের সহিত অনুপমের বিবাহ হইয়া গেল। অপরূপ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া অপরূপ রূপ ও একরাশ অর্থ লইয়া শশিমুখী বসুদিগের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

প্রথম যেদিন টাকার বোঝা মাথায় লইয়া, রূপের প্রভা চারিদিকে ছড়াইয়া শশিমুখী আসিয়া বসুদিগের বাটীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন; সেদিন গর্ব্বে ও আনন্দে সরোজবাসিনীর দুইটী নয়ন হইতেই অবিরত অশ্রুধারা ঝরিয়া ছিল। শাশুড়ী নাই,—তিনিই বাটীর গৃহিণী। বিবাহের পরদিন যখন অনুপম আসিয়া নববধূকে বৌদিদির চরণপ্রান্তে উপস্থিত করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন, তখন সরোজবাসিনী বধূর মুখখানি তুলিয়া চিবুক ধরিয়া উপস্থিত আত্মীয় কুটুম্ব ললনাগণকে মহাগর্ব্বে বলিয়াছিলেন, 'ঘরে বৌ আনতে হ'লে এমনি ;—এমন না হ'লে বউ!'

কিন্তু বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতেই সরোজবাসিনীর সে ভুল ভাঙ্গিয়া গেল। বধূর সহিত কিছুদিন ব্যবহার করিয়াই বুঝিলেন যে, ছোট বৌ রূপ ও অর্থের সহিত আরও দুইটা জিনিষ এত অধিক পরিমাণে আনিয়াছেন যে, তাহা সংসারে মিল-মিশ করিয়া থাকিবার পক্ষে একেবারেই অন্তরায়। স্ত্রীলোকের সর্ব্বাপেক্ষা যাহা প্রধান দোষ, অভিমান ও অহঙ্কার, সেই দুইটাই বেলুনের মত ছোট বৌএর দেহের ভিতর পরিপূর্ণভাবে বিরাজিত থাকিয়া তাহাকে একেবারে স্ফীতা করিয়া দিয়াছে। বধূর আচরণ তাঁহার নিকট একেবারে বিসদৃশ ঠেকিলেও সে কথা কাহারও নিকট মুখ ফুটিয়া বলিবার উপায় ছিল না; কারণ তিনিই যে বিবাহের প্রধান পাণ্ডা। অনেক দেখিয়া শুনিয়া, বাছিয়া গুছিয়া তিনিই যে এই পাত্রীটি স্থির করিয়াছিলেন। মহা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনিই জোর

করিয়া দেবরের বিবাহ দিয়াছিলেন। সরোজবাসিনীর অনেক ধৈর্য্য, তাই ছোটবধূর লাঞ্ছনা গঞ্জনা—এই পাঁচ ছয় বৎসরকাল নীরবে মুখ বুজিয়া সহ্য করিয়া আসিতেছিলেন। মনকে তিনি এই বলিয়া প্রবোধ দিতেন—'ছেলে মানুষ—বুদ্ধি নেই,—একটু বয়স হ'লেই শুধ্‌রে যাবে।' কিন্তু ছোট বৌ শুধ্‌রাইলেন না, বরং বয়সের সহিত তাঁহার অহঙ্কার ও অভিমানের মাত্রাটা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

উপরের ঘরের বারান্দার সম্মুখে বসিয়া সরোজবাসিনী কন্যার চুল বাঁধিয়া দিতেছিলেন। শান্তি চুলের দড়ি ধরিয়া আকাশের পানে চাহিয়া, নীল আকাশে সাদা মেঘের খেলা বোধ হয় দেখিতেছিল। তাহার রংটুকু বেশ টুকটুকে, বয়স দ্বাদশের ঊর্দ্ধ নহে। জননী তাহার একরাশ কুঞ্চিত চুল মোটা চিরুণীর সাহায্যে জট ছাড়াইয়া দিতেছিলেন। চিরুণীর টানে কন্যার দুই চারি গাছি চুলও ছিঁড়িয়া আসিতেছিল, তাহাতে শান্তির সেই সুন্দর ঢল্‌ঢলে মুখখানির উপর অস্বাচ্ছন্দ্য ভঙ্গি হইতেছিল। সেই সময় বামী ঘট্‌কি আসিয়া তথায় হাজির হইল। বামীকে দেখিয়া সরোজবাসিনী কন্যার চুল আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "এই যে ঘটক ঠাক্‌রুণ, সব ভাল তো,—কোন পাত্র টাত্রের সন্ধান পেলেন ?"

বারান্দার রেলিংয়ের উপর একখানি আসন শুখাইতেছিল; বামী সেইখানা টানিয়া লইয়া সরোজবাসিনীর সম্মুখে বেশ করিয়া চাপিয়া বসিল। বামীর বয়স হইয়াছে, কিন্তু বাহার অনেক। পরিধান একখানি বেশ পরিষ্কার রেলির উনোপঞ্চাশ থান, তাহার

উপর-অঙ্গে একখানি রাধাকৃষ্ণ-ছাপ-অঙ্কিত নামাবলি, চোখে সোণার চসমা। ঘটকিগিরী ব্যবসায় সহরের মধ্যে সে বেশ একটু ডাক-সাইটে হইয়া উঠিয়াছিল। বামী নাকটা একটু সিট্‌কাইয়া আরম্ভ করিল, "দিদিমণি, একটী বেশ ভাল পাত্র আছে। ছেলেটি বি, এ, পাস ক'রে এম, এ, পড়ছে। বাপের কল্‌কাতায় তিন চার খানা বাড়ী। তবে কি জান দিদিমণি, একটু খাঁই বেশী। চার হাজার – চার হাজার হাঁকছে, তা তিন হাজার হ'লে যাহ'ক্ ক'রে আমি রাজি কর্ত্তে পার্‌ব।"

সরোজবাসিনী কন্যার খোঁপায় কাঁটা গুজিয়া দিতে দিতে মুখ তুলিয়া বলিলেন, "তিন হাজার টাকা! এত টাকা কোথায় পাব বল! দু'হাজার টাকার মধ্যে হয় না?"

বামী ঘাড় নাড়িল, বলিল, "চার হাজার টাকাই পড়্‌তে পায় না,—তা দু'হাজার টাকা। দিদিমণি, তোমার বাপের বাড়ীর সঙ্গে কি আমার আজকের জানা শোনা গা, তারপর একটা যুগ চলে গেছে। তোমার আগাগোড়া সব মাসীর বিয়েই এই বামীর হাত দিয়ে হয়েছে। তোমার মেয়ে,—তাই ধরে পড়ে তিন হাজার টাকায় কর্ত্তে পারি, তার কম হ'লে আর হয় না! বাবুকে ব'লে দেখ, যদি রাজি কর্ত্তে পারো।"

সরোজবাসিনী কি বলিতে যাইতেছিলেন, সেই সময় ছোটবৌ শশিমুখী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমস্ত দিন নিদ্রার পর বৈকালে উঠিয়া নিত্য নূতন ভঙ্গিমায় পাতা কাটিয়া চুল বাঁধিবার

তাঁহার ঘটা পড়িয়া যাইত। এক ঘণ্টা কাল নানাভাবে দর্পণের সম্মুখে হেলিয়া তুলিয়া শেষ কোন ক্রমে অপচ্ছন্দের ভিতর দিয়া চুল-বাঁধা শেষ হইত। তাহার পর কলতলায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাটিত। সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাঁহার বেশের পারিপাট্যটা কিছু জাঁকিয়া উঠিত। একখানি মিহি শুভ্র দেশী শাড়ী পরিয়া, লেসের জ্যাকেট অঙ্গে আঁটিয়া, মুখে 'ব্লুম' প্রভৃতি লাগাইয়া তিনি বেশ একটু ফিট্‌ফাট্ হইতেন। নব্য সভ্য সম্প্রদায়ের বাতাস পাইয়া তিনি বেশ একটু সভ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। কাজেই পবিত্র হিন্দু অন্তঃপুরের তিনি একেবারেই অযোগ্যা হইয়া দাঁড়াইতেছিলেন। তিনি তাঁহার কক্ষটির ভিতর সমস্ত দিনই সাজ সজ্জা ও উপন্যাস পাঠ লইয়া থাকিতেন। সংসারের কাজ কর্ম্মে ভুলিয়াও একবার হাত দিতেন না;—কাজেই সংসারের সমস্ত কাজ কর্ম্মই সরোজবাসিনীকে একাই করিতে হইত; সেজন্য তিনি ছোটবৌকে কোন দিন কোন কথা বলিতেন না। শশিমুখী পাণ খাইয়া ঠোঁট দুইটি টুক্‌টুকে লাল করিয়া হেলিয়া দুলিয়া বড় জা'য়ের সম্মুখে আসিয়া রেলিংএর উপর ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইলেন। ছোটবৌকে দেখিয়া স্বামী বেশ একটু মৃদু হাসিয়া আবার আরম্ভ করিল, "ছোট্‌ঠাকরুণ, শান্তির জন্যে একটি বেশ ভাল পাত্রের সন্ধান পেয়েছি। যেম্‌নি ঘর,—তেম্‌নি ছেলে, তবে খাঁই কিছু বেশী। তা ছেলের তুলনায় সে কিছুই নয়। হাজার তিনেক হ'লেই হয়।"

শশিমুখী তাঁহার সুন্দর মুখখানি বেশ একটু বিকৃত করিয়া

যেন অবজ্ঞাভরে বামীর কথার উত্তর দিলেন, "তিন হাজার টাকা! বট্‌ঠাকুর তিন হাজার টাকা পাবেন কোথায়? মোটে তো পঞ্চাশটী টাকা মাইনে পান। তাতে নিজেদেরই খোরাক চলে না। কোত্থেকে মেয়ের বিয়েতে তিন হাজার টাকা খরচ ক'রবেন। ঘটকঠাক্‌রুণ তোমার যেমন খেয়ে দেয়ে কাজ নেই। চার পাঁচ শো টাকার মত একটী পাত্র দেখ,—যা হবে।"

বামী বোসেদের বাড়ীর অনেক কথাই জানিত,—তাহার এ বাড়ীতে অনেক দিন হইতেই আনাগোনা। সে গম্ভীরভাবে বলিল, "বড়বাবুর আবার ভাবনা কিসের ছোট্‌ঠাক্‌রুণ,—অমন যার ভাই, তার আবার টাকার চিন্তা। শান্তির বিয়েতে কি আর ছোটবাবু তিন হাজার টাকা খরচ কর্ত্তে পারেন না?"

বামীর কথায় শশিমুখীর ভিতরটা একেবারে জ্বলিয়া উঠিল, তিনি এক অদ্ভুত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "তা পারিবেন না কেন! ওই ভায়ের পায়েই সর্ব্বস্ব ঢেলেইতো সর্ব্বস্বান্ত হ'য়েছেন। এখনও যদি সাবধান না হন, এই তোমায় বলে রাখলুম ঘটকঠাকরুণ শেষ যদি ভিক্ষে করে না খেতে হয় তাহ'লে এইখানে আমি মেপে দশটী হাত নাকখৎ দেব। তখন বুঝতে পারবেন,—ভাই ভাজ মুখ ফিরেও চাইবে না।"

ছোটবৌয়ের কথা শুনিয়া বামী একটুও আশ্চর্য্য হয় নাই,—কলিকাতার অনেক অন্তঃপুরেই তাহার প্রবেশ ছিল। বড়বৌ, মেজবৌ, ছোটবৌ, সে অনেক প্রকারই দেখিয়াছে, অনেক কথাই

শুনিয়াছে, তাহার কাছে আর কিছুই নূতন নাই ; কিন্তু সরোজবাসিনী বিস্ময়ে একেবারে অবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন। একটা বাহিরের লোকের সম্মুখে কেমন করিয়া মানুষ এমন করিয়া ঘরের কথা প্রকাশ করিতে পারে, তাহাই ভাবিয়া তাঁহার কণ্ঠ রোধ হইয়া গিয়াছিল। তিনি অনেক দিন হইতেই ছোটবৌয়ের ট্যাক্ ট্যাক্ কথা নীরবে সহ্য করিয়া আসিতেছিলেন ; কিন্তু আজ আর সহ্য করিতে পারিলেন না। একটা সামান্য ঘট্‌কির সম্মুখে ছোট বৌয়ের কথাগুলো এমনি তীব্রভাবে যাইয়া তাঁহার বুকের ঠিক মধ্যস্থলে আঘাত করিল যে, তাঁহার ধৈর্য্যের বাঁধ একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। দুঃখে ঘৃণায় তাঁহার নয়নে অশ্রু আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল,—তিনি জোর করিয়া তাহা দমন করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "ছোটবৌ! কথা কইতে যখন জানোনা, তখন কথা কইতে এস কেন্। আগে কথা কইতে শেখ, তারপর লোকের সম্মুখে কথা কইতে যেও।"

শশিমুখী অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিলেন, "টাকার ঘরে ঘা পড়্‌লেই মানুষের অমনি ভেতরটা জ্ব'লে উঠে। তা রাগ কল্লে কি কচ্ছি বল দিদি,—তোমাদের জন্যেতো আর ওঁকে সর্ব্বস্বান্ত হ'তে দিতে পারিনি।"

সরোজবাসিনীর আর মুখ হইতে কথা বাহির হইল না,—ধিক্কারে এক ফোঁটা অশ্রু তাঁহার গণ্ড বহিয়া ঝরিয়া পড়িল। স্বামী কি বলিতে যাইতেছিল সেই সময় সিঁড়িতে অনুপমের চটির

চট্‌চট্‌ শব্দ হইল। ছোটবৌ তাড়াতাড়ি এক হস্ত পরিমাণ ঘোমটা টানিয়া দিলেন। অনুপম উপরে আসিয়া সম্মুখেই স্বামীকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কিগো ঘটকঠাকরুণ, শান্তির জন্য একটা পাত্র টাত্রের সন্ধান পেলে; খুব ভাল পাত্র হওয়া চাই। আমি শান্তির বিয়েতে ছ'টা হাজার টাকা খরচ করবো, মনে থাকে যেন, এই বুঝে পাত্রের সন্ধান করবে।"

ঘোমটার ভিতর হইতে স্বামীর কথা শুনিয়া শশিমুখী ফোঁস করিয়া উঠিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা অনুপমের কর্ণে প্রবেশ করিল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

—:০:—

এক আসর সমজদার শ্রোতার সম্মুখে যদি সহসা যাত্রার কোন জুড়ী একটা বেফাস বেসুরা তান মারে, তাহা হইলে যাত্রার অধিকারী মনের অবস্থা যেমন ব্যক্ত করিতে না পারিয়া, ভিতরে ভিতরে একেবারে আগুন হইয়া উঠে, স্বামীর ব্যবহারে শশিমুখীরও ঠিক সেই অবস্থা ঘটিল। স্বামীকে ঘটকঠাকরুণের সম্মুখে জুত করিয়া বসিতে দেখিয়া রাগে তাঁহার সর্ব্ব শরীর জ্বলিয়া গেল। তিনি আর তথায় দাঁড়াইতে পারিলেন না, চোখ মুখ লাল করিয়া একেবারে হন্ হন্ করিয়া নিজের কক্ষের দিকে চলিয়া গেলেন। অনুপম ঘটকঠাকরুণের সম্মুখে বসিয়াছিলেন,—সহসা পত্নীর এরূপ ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে অধিকক্ষণ এ অবস্থায় থাকিতে হইল না; বামী কথা পাড়িল, বলিল, "তা তোমরা যাই বল বাছা, আমি তো পাঁচ দরজায় ঘুরে বেড়াই, এমন বৌ বাবু কোথায়ও দেখিনি। ছোটবাবু, আপনিই আদর দিয়ে দিয়ে বৌটীর মাথা একেবারে খেয়েছেন।"

শশিমুখীর গমনের ভাব দেখিয়াই অনুপম বুঝিয়াছিলেন,—যাহা হউক একটা কিছু ঘটিয়াছে। এই পাঁচ ছয় বৎসরকাল পত্নীর সহিত ব্যবহার করিয়া, পত্নীর হাল-চাল তাঁহার নিকট কিছুই অবিদিত ছিল না। বেতো ঘোড়াকে যতই চাবুক মারো, সে যেমন

তাহার পশ্চাৎ দিক্‌কার পদদ্বয় তুলিবেই, - সেইরূপ নানা ভাবে নানা দিক দিয়া শাসন করিয়াও পত্নীকে কিছুতেই বাগ মানাইতে না পারিয়া শেষ অনুপম হতাশ হইয়া তাহাকে আর কিছুই বলিতেন না। বামীর কথায় তিনি মৃদু হাসিলেন, বলিলেন, "পুরুষ কখনও স্ত্রীলোককে শাসন কর্ত্তে পারে? ঘটকঠাকরুণ তোমার স্বামী কি আর তোমায় শাসন কর্ত্তে পারতেন, যদি তুমি নিজে না শাসিত হতে? স্ত্রীলোকের গায়ে যখন হাত তোলা বিধি নেই, তখন জেনো, সে শাসনেরও বার।"

অনুপমের কথার মাঝখানেই বামী বাধা দিয়া বলিল, "ছোট-বাবুর এক অনাছিষ্টি কথা, পুরুষে আবার নাকি স্ত্রীলোককে শাসন কর্ত্তে পারে না? তা যাই বল ছোটবাবু, এমন বড় জায়ের মুখের উপর ট্যাক্ ট্যাক্ করে 'যা-না-তা' বল্‌তে আমরা কখনও শুনিনি। দিদিমণির অনেক সহ্য—তাই এমন চুপ করে থাক্‌তে পারে, আমরা তো বাবু বরদাস্ত কর্ত্তে পারতেম না।"

বামীর কথায় অনুপমের দৃষ্টি সরোজবাসিনীর মুখের উপর পড়িল। তিনি এতক্ষণ লক্ষ্য করেন নাই, বৌদিদির মুখখানি আজ একেবারে কালী হইয়া গিয়াছে। কাণায় কাণায় বৃষ্টি লইয়া শ্রাবণের একখণ্ড মেঘ যেন তাঁহার সমস্ত মুখখানি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে; বাতাস নাই, নতুবা এতক্ষণ বৃষ্টি ঝরিয়া পড়িত। যে মুখখানিতে মধুর হাসি সতত উদ্ভাসিত থাকিয়া বন্ধুদিগের ক্ষুদ্র সংসারে স্বর্গ সৃষ্টি করিত, আজ তাহা মলিন দেখিয়া সমস্ত বিশ্বসংসার অনুপমের

নিকট একেবারেই বিষাদ হইয়া গেল। তিনি পৃথিবীতে সব সহ্য করিতে পারিতেন; কিন্তু বৌদিদির মলিন মুখ কিছুতেই দেখিতে পারিতেন না। ব্যাপারটা কি, না জানিলেও তাঁহার ভিতরটা একেবারে জ্বলিয়া উঠিল। পত্নীর উপর তাঁহার যত রাগ না হইল, তাহার চতুর্গুণ রাগ হইল তাঁহার বৌদিদির উপর। তাঁহার মুখখানা একেবারে গম্ভীর হইয়া গেল, তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "ঠিক হয়েছে, সাধ করে বৌ এনেছেন, একটু সহ্য করবেন না! তখন যে আমার কথায় একেবারে কাণই দেওয়া হ'লো না। নিজে দেখে শুনে বৌ এনেছেন, এখন তার মজাটা নিন।"

অনুপমের কথার উত্তরে কেহই কোন কথা কহিল না। সরোজবাসিনীর হৃদয়ের ভিতর অশ্রু-সমুদ্র তোল পাড় করিতেছিল তিনি বহু কষ্টে তাহাকে কোন ক্রমে চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। আর বুঝি চাপা থাকে না। কিন্তু যেমন করিয়াই হউক চাপিয়া রাখিতেই হইবে। মানুষ যদি লোকের নিষেধ সত্বেও বৌটী লইয়া নাড়িতে নাড়িতে সহসা হাত কাটিয়া ফেলে, তাহা হইলে তাহার যন্ত্রণা যতই ভয়ঙ্কর হউক না কেন, পাছে অন্যে আহাম্মক ভাবে সেই আশঙ্কায় সে যেমন সেটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করে, সরোজ-বাসিনীও সেই চেষ্টায় ছিলেন; কিন্তু তখনও ছোটবৌএর কথার আঘাতটা তীব্রভাবে তাঁহার হৃদয়ে বাজিতেছিল, সেইজন্য তিনি তাঁহার দেবরের কথার কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। তাঁহার দুর্ব্বল হৃদয়—কি জানি যদি কিছু বেফাস বাহির হইয়া পড়ে।

অনুপম কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া প্রথম রাগের ধমকটা একটু দমন করিয়া, সহসা শান্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর কাকী মা, তোর মাকে কি বলেছে রে?"

আর নীরব থাকিলে হয়তো এখনি কন্যা একটা কিছু বেফাস বলিয়া ফেলিবে, কাজেই জোর করিয়া হাসিয়া সরোজবাসিনী তাড়াতাড়ি বলিলেন, "কি বল্‌বে আবার! ও পাগল, ওর কথা কি আর সব ধর্ত্তে আছে!"

বৌদিদির মুখে আবার হাসি দেখিয়া অনুপমের প্রাণটা কতক শান্ত হইল। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বৌদিদি তা হ'লে দেখছি তো তুমি আমার খুব সুহৃদ। দেখে শুনে শেষ একটা পাগল এনে আমার ঘাড়ে তুলে দিলে। তবে সুবিধার মধ্যে এইটুকু আছে, যে জ্বালা শুধু আমাকেই পোয়াতে হবে না, তার ঝাঁজ তোমাকেও পেতে হবে।"

যাহার ঝাঁজ এত তীব্র, তাহার জ্বালা যে কি ভয়ঙ্কর, তাহা সরোজবাসিনী মনে মনে অনুভব করিলেন। যাহার ঝাঁজেই তাঁহার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেয়, তাহার প্রখর জ্বালা তাঁহার দেবর নীরবে সহ্য করিতেছেন ভাবিয়া একটা অসীম করুণায় তাঁহার প্রাণটা একেবারে বিগলিত হইয়া পড়িল। তিনি অতি স্নেহ-কোমল স্বরে বলিলেন, "ঠাকুরপো, ছোটবৌ এখনও ছেলে মানুষ, একটু বয়স হ'লেই যখন সব বুঝবে, তখন আপনি শুধ্‌রে যাবে; কাকেও কিছু বল্‌তে হবে না।"

অনুপম মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "বৌদিদি আর কত দিন তোমার ও বুলি থাক্‌বে। আজ ছ বছর বিয়ে হ'লো, এখনও ছেলে মানুষ! তা হ'লে যে আর কবে বড় হবে, তাতো বুঝতে পারিনে।"

সরোজবাসিনী কথাটায় একটু জোর দিয়া বলিলেন, "না গো না। তুমি দেখ ঠাকুরপো, অমন রূপ, কখনই একেবারে নিস্ফল যাবে না,—এ হতেই পারে না। তুমি দেখ আমার কথা মিথ্যে হবে না।"

বেলার দিকে চাহিয়া বামী বলিল, "তা হ'লে দিদিমণি এখন চল্লুম। একটা পরামর্শ করে কালই যা হয় একটা উত্তর দিয়ে দিও।"

অনুপম উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনিই সরোজবাসিনীর হইয়া উত্তর দিলেন, "এর আবার পরামর্শ কি,—পাত্র যদি ভালো হয়, মেয়ে দেখাবার বন্দোবস্ত কর। শান্তির বিয়ের ভার আমার উপর, ওর সঙ্গে দাদার কোনই সম্পর্কই নেই।"

বামী মৃদু হাসিয়া বলিল, "তা আমরা জানি ছোটবাবু। তা হলে মেয়ে দেখাবারই বন্দোবস্ত করি?"

"নিশ্চয়ই" বলিয়া অনুপম বাহির হইয়া গেলেন। বামী সরোজ-বাসিনীর দিকে ফিরিয়া বেশ একটু মিহিসুরে বলিল, "দিদিমণি, তোমার দ্যাওরের মত এমন মানুষ আর হবে না।"

ঘটকঠাকুরুণের কথায়, আনন্দে গর্ব্বে সরোজবাসিনীর নয়নে অশ্রু উথলিয়া উঠিল। প্রাণের সমস্ত তার যেন একটা স্নেহরসে

আঘাত পাইয়া এক সঙ্গে সমস্বরে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। এই সরল উদার দেব-সম দেবর যে তাঁহাকে জননীরও অধিক ভক্তি করে, একথা স্মরণ হইবামাত্র সরোজবাসিনীর সমস্ত দেহটা একটা অনির্ব্বচনীয় পুলকে একেবারে রোমাঞ্চিত হইয়া গেল। আনন্দে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইল,—তিনি ঘটকঠাকরুণের কথার কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। সরোজবাসিনীকে নীরব থাকিতে দেখিয়া বামী আবার বলিল, "তা হ'লে দিদিমণি সন্ধ্যে প্রায় হ'ল, এখন আমি উঠি। কালই পাত্রের বাড়ী গিয়ে মেয়ে দেখাবার একটা দিন স্থির করতে পারি যদি, তবে আবার কালই খবর দিয়ে যাবো।"

বামী উঠিতে যাইতেছিল, সেই সময় ছোটবৌ হাওয়ার মত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মুখ চোখের ভাব দেখিয়া সরোজবাসিনী একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন। ছোটবৌকে দেখিলেই এদানি কেমন যেন তাঁহার একটা ভয় হইত,—আজ এই মাত্র যে ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার উপর ছোটবৌকে এই ভাবে উপস্থিত হইতে দেখিয়া তিনি একেবারে এতটুকু হইয়া গেলেন। শশিমুখী তথায় উপস্থিত হইয়া একবার তীব্র দৃষ্টিতে বড় জায়ের মুখের দিকে চাহিয়া অতি উগ্র কণ্ঠে বলিলেন, "স্পষ্ট বললেই তো হয় দিদি,—আমি তোমাদের একটা আপদ বালাই হ'য়েছি। অত লাগানো ভাঙ্গানোর দরকার কি,—আমি আমার পথ দেখি। তোমার অতি বড় দিব্যি রইলো দিদি—যদি কোন দিন তুমি আমার কোন কথায় থাক। আর আমারও অতি বড় দিব্যি রইলো, যদি আমি

আর কোন দিন তোমাদের কোন কথায় থাকি। এই আমি গলায় বস্ত্র দিয়ে তোমার পায়ে গড় করছি, যদি কিছু ব'লে থাকি তো আমার ঘাট্ হয়েছে।"

শশিমুখী আঁচলটা গলায় বেষ্টন করিয়া ঢিপ ঢিপ করিয়া সরোজবাসিনীর পায়ের গোড়ায় কয়েকবার মাথা ঠুকিয়া যেমন ভাবে আসিয়াছিলেন, আবার ঠিক সেই ভাবেই ঝড়ের মত হন্ হন্ করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। সরোজবাসিনীর মুখ হইতে একটাও কথা বাহির হইল না,—তিনি ছোটবৌএর আচরণে একবারে কাট হইয়া গিয়াছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অপূর্ব্ব আফিস হইতে যখন বাড়ী ফিরিতেন,—তখন রাত্রি দুই দণ্ড তিন দণ্ড উত্তীর্ণ হইয়া যাইত। তিনি সবেমাত্র আফিস হইতে ফিরিয়া তাঁহার চিরপ্রিয় হুকাটীর উপর একটী কলিকা চড়াইয়া বিভোর হইয়া তামাক সেবন করিতেছিলেন। সমস্ত দিনের নিদারুণ পরিশ্রম, তামাকের ধূমের সহিত যেন চাপ্ চাপ্ হইয়া তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইয়া দেহটাকে ক্রমেই হাল্কা করিয়া দিতেছিল। মহা আরামে চক্ষু দুইটী ক্রমেই মুদিয়া আসিতেছিল;—সেই সময় একটা কাচের পেয়ালায়, এক পেয়ালা উষ্ণ চা লইয়া শান্তি গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। সে পিতার নিকট আসিয়া অতি মধুর স্বরে বলিল, "বাবা চা এনেছি।"

অপূর্ব্ব চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তামাকের ধূমে ঘরখানি আচ্ছন্ন করিতেছিলেন,—কন্যার স্বর কর্ণে প্রবেশ করায় চমকিত হইয়া চক্ষু মেলিলেন। পেয়ালা পরিপূর্ণ গরম চা দেখিয়া তাঁহার মুখে চোখে বেশ একটা আনন্দের ভাতি ফুটিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি কন্যার হস্ত হইতে চায়ের পেয়ালাটা গ্রহণ করিয়া মেজের উপর রাখিলেন। তাহার পর হুকাটি কন্যার হস্তে দিয়া বলিলেন, "হুকোটা রাখ্‌তো মা।"

শান্তি পিতার হস্ত হইতে হুকাটি লইয়া গৃহের এক কোণে রাখিল। অপূর্ব্ব চায়ের পিয়ালাটা তুলিয়া লইয়া তাহাতে একটা চুমুক দিয়া বলিলেন, "তোর মায়ের মুখটা আজ ভার ভার দেখ্‌লুম কেনরে শান্তি ?"

শান্তি পিতার সম্মুখে আসিয়া বসিয়াছিল, সে গম্ভীর ভাবে বলিল, "কাকীমা আজ যে ঝগড়া করেছে! তারপর গিয়ে, সেই যে শুয়েছে, আর তো ওঠেনি ; মা কত ডাকাডাকি কর্‌লে, কাকীমা মোটে সাড়াই দিলে না ; তাই আজ মা বড় রেগে গেছে।"

অপূর্ব্ব কেবল মাত্র কন্যার কথার উত্তরে একটী ছোট্ট 'হুঁ' দিয়া আপন মনে চা পান করিতে লাগিলেন। শান্তি কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পিতার মুখের প্রতি চাহিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিল, "হাঁ বাবা, মার সঙ্গে কাকীমার অত ঝগড়া হয় কেন ?"

অপূর্ব্ব একবার তাঁহার কন্যার প্রতি স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন, তিনি এই 'কেনর' উত্তর আকাশ পাতাল ভাবিয়াও স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। কয়েক দিন হইতে তিনিও এই 'কেন' লইয়াই ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন,—কিছুতেই আর এই 'কেন-টার' একটা মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। কন্যার প্রশ্নে 'কেন' ঠিক সেই 'কেনই' রহিল, তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তাইতো মা! আমারও মনে হয়—কেন ?"

শান্তি কি বলিতে যাইতেছিল, সেই সময় সরোজবাসিনী একটা ছোট রেকাবীতে কয়েকখানি লুচি ও কয়েকটা আলুভাজা

লইয়া গৃহের ভিতর অতি বিরক্তভাবে প্রবেশ করিয়া স্বামীর সম্মুখে রেকাবীখানা সজোরে নামাইয়া রাখিলেন। তাঁহার মুখের উপর বিরক্তি, আজ যেন একটা রেখা পরিস্ফুট ভাবে আঁকিয়া দিয়াছিল। তিনি যে ভাবে গৃহে প্রবেশ করিয়া স্বামীর সম্মুখে রেকাবীটা রাখিয়া দিলেন, তাহাতেই তাঁহার বিরক্তির ভাব অতি পরিষ্কার রূপে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। অপূর্ব্ব একবার বঙ্কিম ভাবে পত্নীর মুখের দিকে চাহিলেন, কিন্তু কথা কহিলেন না। সরোজবাসিনী রেকাবীখানা স্বামীর সম্মুখে রাখিয়া মস্তকের উপর কাপড়টা একটু টানিয়া দিলেন, তাহার পর দরজার নিকট যাইয়া মুখখানা আরোও ভারী করিয়া বাহিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিলেন। শান্তি ধীরে ধীরে বলিল, "বাবা লুচি খাবে না,—রেকাবীখানা টেনে নাও না!"

অপূর্ব্ব আবার একটা 'হুঁ' দিয়া রেকাবীখানা টানিয়া লইলেন। নীরবে একখানি করিয়া লুচি রেকাবী হইতে তুলিয়া লইয়া খাইতে লাগিলেন। পাছে কতকগুলা বাজে কথা শুনিতে হয়, সেইজন্য তিনি তাঁহার পত্নীকে একেবারেই ঘাঁটাইতে নারাজ ছিলেন, কিন্তু না ঘাঁটাইলে কি হইবে—সরোজবাসিনী নিজেই কথা পাড়িলেন। স্বামী কিছু জিজ্ঞাসা না করায় তাঁহার রাগটা যেন আরও বাড়িয়া গেল; তিনি বিরক্ত-ভাবে বলিলেন, "নাও—খাওয়া হ'লো—না আমি তিনঘণ্টা বসে থাক্‌বো"।

অপূর্ব্ব পত্নীর কথাটার ভাব বুঝিলেন ; মনে মনে মৃদু হাসিয়া পত্নীর দিকে ফিরিয়া কি বলিতে যাইতেছিলেন কিন্তু শান্তি তাড়াতাড়ি বলিল, "তুমি যাও না মা, আমি তো বাবার কাছে বসে আছি।"

সরোজবাসিনী ছুঁতা খুঁজিতেছিলেন। কন্যার কথায় তিনি ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, "তোর আর সব কথায় মড়লী কর্ত্তে হবে না। সবাই মিলে চারিদিক থেকে পড়ে আমার গায়ের মাংসগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে খা— মরণ তো হয় না!"

অপূর্ব্ব গম্ভীরভাবে বলিলেন, "এতে মরণই বা কোথা থেকে এলো ; আর তোমার মাংস ছিঁড়ে খাবার কথাই বা কোথা থেকে হ'লো। ওতো ভাল কথাই বল্লে,—তোমার যদি কাজ থাকে—তুমি যাও না কেন।"

সরোজবাসিনী সেইভাবেই উত্তর দিলেন, "তোমার কি, সংসারের তো কোন ধার ধরোনা। মরতে আমারই যত মরণ হয়। ওদিকে ছোট গিন্নি উপুড়-হয়ে পড়েছেন, তার খবর রেখেছ! উল্‌টে কট কট করে কতকগুলো শক্ত কথা—যা নয় তাই শুনিয়ে দিলেন, আবার গিয়ে উপুড় হয়ে পড়েছেন ; যেন যত দোষ আমারই, না বাপু আমার আর জ্বালা সহ্য হয় না।"

অপূর্ব্বের তখন আহার শেষ হইয়া গিয়াছিল, তিনি রেকাবী খানি নামাইয়া কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "যাতো মা, এক গ্লাস জল নিয়ে আয়তো, হাতটা ধুয়ে ফেলি।"

শান্তি জল আনিতে চলিয়া গেল। অপূর্ব্ব পত্নীর দিকে ফিরিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "ছেলে মানুষ, একটু রাগ করে থাকে,—তাতে আর হয়েছে কি। তুমি একটা বুড়ো মাগী, তারও যে বেহদ্দ হ'লে। একেবারে ধেই ধেই করে নাচ্ছ। ছেলে মানুষ, রাগ করেছে—কোথায় একটু বুঝিয়ে স্থুজিয়ে ডেকে আনবে, না নিজেই চেঁচিয়ে বাড়ী মাথায় করে তুল্‌ছ।"

ছোটবৌএর আচরণে একেই সরোজবাসিনীর ভিতরটা পুড়িয়া যাইতেছিল, তাহার উপর স্বামীর তিরস্কারে যেন ইন্ধন সংযোগ করিল। তিনি অত বড় অপমানটাও নীরবে সহ্য করিয়া ছোট বৌএর অভিমান ভাঙ্গাইবার জন্য অন্ততঃ দুই শত্রুবার নানাভাবে সাধাসাধি করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু তথাপি ছোটবৌএর মান ভাঙ্গে নাই। তিনি স্বামীর তিরস্কারের উত্তরে কঠিন ভাবে বলিলেন, "অপরাধ তো সবই আমারই। এত করে ডাক্‌লুম, একটা সাড়া পর্য্যন্ত দিলেন না। যাই—গলবস্ত্র হ'য়ে পায়ে ধরিগে। ওইটাই বাকি আছে,—ওটাই বা আর বাকি থাকে কেন। সবইতো হয়েছে, ওটাও হয়ে যাক্!"

অপূর্ব্বের কথা কহিবার মোটেই ইচ্ছা ছিল না,—সমস্ত দিনের আফিসের পরিশ্রমের পর বাড়ী ফিরিয়া শুধু শুধু একটা অশান্তি আসিয়া ঘাড়ে চাপিবার উদ্যোগ করিতেছে দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ইতিমধ্যে শান্তি জল আনিয়া উপস্থিত করিয়াছিল, তিনি কন্যার হস্ত হইতে জলের গ্লাসটা লইয়া বলিলেন,

"দেতো শান্তি একটা জামা, ঘড়ীটা মেরামত কর্ত্তে দিয়েছি, আজকে দেবার কথা আছে, দেখি যদি দেয়?"

শান্তি গৃহের পার্শ্বস্থিত কাঠের আল্‌নার উপর হইতে একটা জামা আনিয়া পিতার সম্মুখে ধরিল। অপূর্ব্ব তাড়াতাড়ি হাতটা সেই রেকাবীর উপরে ধুইয়া কন্যার হস্ত হইতে জামাটা গ্রহণ করিলেন। তিনি জামাটা স্কন্ধে ফেলিয়া গৃহ হইতে বাহির হইতে যাইতে ছিলেন, সেই সময় অনুপম আসিয়া ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। অনুপমকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অপূর্ব্বের আর বাহির হওয়া হইল না,—তিনি ভ্রাতার কথাটা শুনিবার জন্য আবার একটু দাঁড়াইলেন। অনুপম গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বৌদি আমি তোমায় একেবারে খুঁজে খুঁজে হাল্লাক। দেখবে চল, একটা কত বড় ইলিস মাছ নিয়ে এসেছি,—পাক্কা আড়াই সের ওজন। এত বড় ইলিস মাছ জীবনে তুমি কখনও দেখনি। একেবারে ধড়্‌ফড় কচ্ছে।"

গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া অনুপম তাঁহার ইলিস্ মাছের বর্ণনা লইয়াই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, বৌদিদির মুখের প্রতি লক্ষ্য করিবার এতক্ষণ তাঁহার অবসরই হয় নাই। কথাটা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার দৃষ্টি বৌদিদির মুখের উপর পতিত হইল। বৌদিদির বিরক্তিপূর্ণ গম্ভীর মুখখানি দেখিয়া তিনি আবার একটু মৃদু হাসিয়া আরম্ভ করিলেন, "তাই তো

বসি বৌদি গেল কোথায়! দাদা বুঝি আফিস থেকে ফিরতে না ফিরতেই গাওনা সুরু হয়ে গেছে। তা আজকের পালাটা কি! গোড়া থেকে যদি আবার সুরু কর, তা হ'লে না হয় আমিও বসি।"

দেবরের কথায় সরোজবাসিনী বিরক্তভাবে বলিলেন, "না ঠাকুরপো আমার আর সহ্য হয় না। যা হউক এর একটা ব্যবস্থা কর। আমি একেবারে জ্বলে পুড়ে মলুম। কথায় কথায় রাগ,— কথায় কথায় অভিমান, গেরস্তের সংসারে এমন কল্লে কি চলে। সেই সন্ধ্যে বেলা গিয়ে উপুড় হয়ে পড়েছেন, কত সাধাসাধি কর্‌লুম খাবারটা পর্য্যন্ত খেয়ে যেতে পারলেন না। না বাপু,—এমন করে কষ্ট দিলে কি আর মানুষ বাঁচে।"

অনুপম মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "এরই মধ্যে হাল ছাড়লে চলবে কেন বৌদি? সাধ করে দ্যাওরের বিয়ে দিয়েছ, একটু কষ্ট সহ্য করবে না। এই তো সবে আরম্ভ, এখনও সমস্ত জীবনটাই পড়ে রয়েছে।"

দেবরের কথায় সরোজবাসিনীর মেজাজ আরও একটু চড়িয়া গেল, তিনি বেশ একটু উঁচু পর্দ্দায় পরিলেন "কি কথা যে বল ঠাকুরপো, তার মাথা মুণ্ড নেই। নিজের বৌকে একটু শাসন কত্তে পারো না, আবার মুখ নেড়ে কথা কইতে এস।"

অপূর্ব্ব দাঁড়াইয়া ছিলেন কন্যার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "চ'রে শান্তি, দেখিগে যাই, তোর কাকাবাবু কি রকম ইলিস মাছ কিনে আন্‌লে।"

তাহার পর পত্নীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "নাও এখন দরজা থেকে ওঠো,—আমাদের বেরুতে দাও। তারপর দুজনে পড়ে যত পার লাটালাঠি কর।"

সরোজবাসিনী ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, "তুমি তো শুধু আমাকে লাটালাঠি কর্ত্তেই দেখ। তোমার মত মানুষের সঙ্গে কথা কইতে যাওয়া ঝকমারি,—অধর্ম্মের ভোগ।"

অপূর্ব্ব কন্যার সহিত গৃহে হইতে বাহির হইতে হইতে বলিলেন, "বুঝেছ তো,—বুঝ্‌লেই বাঁচি।"

অপূর্ব্ব গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন, সরোজবাসিনী মৃদুস্বরে বলিলেন, "ঠাকুরপো, যাও ডেকে দাওগে,—খাবারটা খেয়ে আমার মাথা রক্ষা করে যান।"

বৌদিদির কথায় অনুপম গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "আচ্ছা বৌদি, তোমার এত সাধাসাধি করবার দরকারটা কি বল্‌তে পার? তুমিই তো আদর দিয়ে দিয়ে ওর মাথাটা খাচ্ছ। তুমি সেধ না দিখি,—দেকি কত দিন না খেয়ে থাক্‌তে পারে।"

সরোজবাসিনী তাঁহার দেবরের কথার মাঝখানেই বাধা দিলেন, বিরক্ত ভাবে বলিলেন, "না বাপু বাড়ীতে ওমন উপোস করে পড়ে থাক্‌বে, তা আমি কিছুতেই সহ্য কর্ত্তে পারবো না।"

"না পার পায়ে ধরে ডেকে এনে খাওয়াও,—ডেকে দেওয়া আমার কর্ম্ম নয়," বলিয়া বৌদিদিকে আর কিছু বলিবার অবসর না দিয়াই অনুপম গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

স্নেহ এমনি পদার্থ,—তাহা যদি একবার প্রাণের ভিতর সঞ্চারিত হয় তাহা হইলে তাহার জন্য মানুষ সমস্তই সহ্য করিতে পারে। সরোজবাসিনী ছোট বৌকে সত্যই স্নেহ করিতেন,—কাজেই দেবরের কথায় তাহার চক্ষে অশ্রু উছলিয়া উঠিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বোসেদের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া বামী নিশ্চিন্ত ছিল না। কয়েকদিন অনবরত পাত্রের বাটীতে হাঁটাহাঁটি করিয়া অতি শীঘ্রই সে পাত্রী দেখাইবার একটা দিন স্থির করিয়া ফেলিল। পাত্রের পিতা একদিন প্রাতে শান্তিকে দেখিতে আসিলেন। শান্তিতে অপচ্ছন্দের মত কিছুই ছিল না। তাহার বর্ণ সুন্দর, দেহ সুন্দর, সুদীর্ঘ কুঞ্চিত ঘন কেশগুলি আরও সুন্দর। যাহার চক্ষু আছে সে তাহাকে কিছুতেই অপচ্ছন্দ করিতে পারে না। কার্য্যেও তাহাই হইল;—পাত্রের পিতা তাহাকে দেখিবা মাত্র পচ্ছন্দ করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার পচ্ছন্দের মাত্রটা এত অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছিল যে, তিনি অপূর্ব্বকে একেবারে বেহাই সম্বোধন করিয়া বসিলেন। তিনি স্পষ্টই বলিলেন, "বেহাই,—আপনার মেয়েটী যথার্থই সুন্দরী,—বৌ করবার উপযুক্তই বটে। আমার তো সম্পূর্ণ পচ্ছন্দ,—এখন আপনি অনুগ্রহ করে কন্যাটিকে যদি দান করেন, তা হ'লে পুত্রবধূ করে সুখী হই।"

কিন্তু যদি শুধু তিনিই সুখী হইলে সব হইত, তাহা হইলে এত দিন বোধ হয় বিবাহটাও সম্পূর্ণ হইয়া যাইত। পাত্রের মাতা কিন্তু শুধু মেয়েটির পচ্ছন্দতেই সুখী হইতে পারিলেন না।

পুত্র জন্মিবার পর হইতে এই চব্বিশ পঁচিশ বৎসর কাল তিনি মনে মনে পুত্রের বিবাহে যাহা যাহা পাইবার একটা মোটামুটি ফর্দ্দ আঁচিয়া রাখিয়াছিলেন,—এবং তিনি যত বিবাহে উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহার গুরুত্বের পরিমাণটা ততই বাড়িয়া উঠিয়াছিল। এক্ষণে তাহা পেষ করিতে বিন্দুমাত্রও ইতঃস্তত করিলেন না। কন্যার অপরূপ রূপের বর্ণনা প্রভৃতি শুনিয়া তিনি নামমাত্র নরম হইলেন বটে, কিন্তু একেবারে গলিয়া পড়িলেন না। বামীও ছাড়িবার পাত্রী নহে, তাহার বচন ও আনাগোনার ঘটায় ফর্দ্দেরও একরূপ মীমাংসা হইয়া আসিল; কেবল মাত্র দুই শত টাকায় আটকাইয়াছে। কাজেই বলিতে হইবে শান্তির বিবাহ একরূপ স্থির হইয়া গিয়াছে।

জ্যৈষ্ঠ মাসের কার্য্যটা শেষ হইতে এখনও দশ বার দিন বিলম্ব। কিন্তু বর্ষারাণী এবার যেন কিছু আগাইয়া আসিয়া পড়িয়াছেন। তিনি ইহারই মধ্যে তাঁহার কার্য্য সুরু করিয়া দিয়াছেন। আজ কয়েকদিন হইতে ক্রমাগত ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি পড়িতেছে। কাদায় কাদায় কলিকাতার রাস্তাঘাট পরিপূর্ণ। রাস্তায় বাহির হইবার উপায় নাই। বৎসরান্তে বর্ষারাণী কলিকাতার সৌধ-শিখরপুঞ্জের উপর নামিয়া আসিয়া তাহাদের যেন ধুইয়া পুছিয়া পরিষ্কার করিয়া দিতেছিলেন। অনুপম তাঁহার ত্রিতলের ছাদের সিঁড়ির পার্শ্বের নির্জ্জন শয়ন কক্ষে বসিয়া উন্মুক্ত গবাক্ষ পানে চাহিয়া শান্তির বিবাহের খরচের মনে মনে একটা খস্‌ড়া করিতে

ছিলেন। আর প্রকৃতির এই স্তব্ধ বিরাটমূর্ত্তির পানে চাহিয়া, ভগবানের বিরাটমূর্ত্তির কতকটা আভাস যেন তাঁহার নয়ন সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছিল। কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে অর্জ্জুন যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা বিরাট না অপূর্ব্ব, তাহা সুন্দর না কুৎসিৎ, এই প্রশ্নই বার বার আপনা হইতেই তাঁহার মনে উদয় হইতেছিল। যাহার মীমাংসা নাই, তাহার তিনি কি মীমাংসা করিবেন! কঠিন সমস্যা নাড়াচাড়া পাইয়া ক্রমেই কঠিনতর হইয়া দাঁড়াইতেছিল। দূরে নিম্নে রাজপথের গ্যাসালোকের উপর বৃষ্টির বড় বড় ফোটা টপ টপ করিয়া পড়িয়া যেন তাহার কাচের আবরণের উপর মুক্তা বসাইয়া দিতেছিল। অনুপমের দৃষ্টি সেদিকে নাই। বাতাস বৃষ্টির সহিত এলোমেলো ভাবে গবাক্ষপথে প্রবেশ করিয়া গৃহের মেজে যে ভিজাইয়া দিতেছিল তাহাও তাঁহার খেয়াল ছিল না। সহসা পদশব্দ কর্ণে প্রবেশ করায় তিনি চমকিত হইয়া ফিরিলেন; দেখিলেন তাঁহার পত্নী গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতেছেন।

শশিমুখী গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া গম্ভীরভাবে স্বামীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সহসা স্বামীর হাতখানি নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "বলি আমার কি একটা কথাও রাখতে নেই?"

অনুপম একবার মাথা তুলিয়া পত্নীর মুখের পানে চাহিলেন। কিন্তু সহসা আজ আবার কিসের সূচনা হইতেছে, তাহা আকাশ পাতাল ভাবিয়াও খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলেন না,—

তিনি পত্নীর দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। শশিমুখী ভূমিকাটি ধীরে ধীরে জমাট করিয়া তুলিতে লাগিলেন, "আমি তো আর তোমার শত্রু নই,—তোমার ভালোর জন্যই বলতে হয়, নইলে আমার আর কি বল না! পাছে তুমি পরে দুঃখ পাও,—পাছে তোমার কষ্ট হয়, তাই আমি ঝগড়া করে মরি। মানুষের অবস্থার কথা—কখন কি হয় বলা যায় না তো!"

পত্নীর কথা শুনিয়া অনুপম একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছিলেন, এতক্ষণ ধরিয়া এতবড় বক্তৃতাটা যে কি উদ্দেশ্যে ব্যক্ত হইল তাহার একটা বর্ণও তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। তিনি তাড়াতাড়ি পত্নীর কথায় বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি তো একসঙ্গে একেবারে অনেক কথা বলে ফেল্‌লে,—কিন্তু কি যে বল্‌লে তার একটা বর্ণও আমি বুঝতে পারলুম না। আমি হঠাৎ দুঃখই বা পেতে গেলুম কেন,—আর তুমিই বা ঝগড়া করে মর কেন—এ দুটো কথারই তো কোন ভাবই বোঝা গেল না।"

স্বামীর কথায় শশিমুখীর এমন জমাট ভাবটা একেবারে মাটি হইবার মত হইল। অহঙ্কার, অভিমান, প্রভৃতি যত দোষই থাকুক, তিনি সত্যই স্বামীকে প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন। স্বামী সেবায় বা স্বামীর যত্নে তাঁহার একদিনের জন্যও অবহেলা ছিল না। তাঁহার প্রধান দোষ,—তিনি অপর কাহারও আঁচ সহিতে পারিতেন না। ভাই, ভাজ, ভাইঝীর জন্য স্বামী যে এমন ভাবে সোপার্জ্জিত অর্থ অপব্যায় করেন, তাহা তাঁহার একেবারেই অসহ্য।

এই পাঁচ ছয় বৎসরকাল নানাভাবে চেষ্টা করিয়াও তিনি তাঁহার স্বামীর এই রোগটা কিছুতেই নিরাময় করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। সম্প্রতি আবার এক কাঁড়ি টাকা শান্তির বিবাহে অনুপম খরচ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন দেখিয়া, তাঁহার ভিতরটা একেবারে আগুনের মত দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। তিনি সেইটাই বন্ধ করিবার জন্য আজ একেবারে কোমর বাঁধিয়া আসিয়াছিলেন। ভূমিকাটা আরম্ভ করিয়াছিলেনও মন্দ নয়,—ভাবিয়াছিলেন কেবল ইঙ্গিত ইসারাতেই স্বামী তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু অনুপমের কথার ভঙ্গিমায় তাঁহার যেন সব এলোমেলো হইয়া গেল। তিনি একটু ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "সেই জন্যই তো বলি, তোমায় এমন ভাল মানুষ পেয়ে ওঁরা যে ঠকিয়ে নেবেন, তা আমি কিছুতেই সহ্য কর্ত্তে পারবো না। সংসারের যখন কিছুই বোঝ না, তখন আমার কথামত চল্‌লেই পারো। এতদিন যদি আমার কথা শুন্‌তে, তা হ'লে এক কাঁড়ি টাকা জমে যেত।"

একেবারে পরিষ্কার না হইলেও অনুপম এতক্ষণে তাঁহার পত্নীর মনের ভাব কতকটা উপলব্ধি করিলেন। আজ পাঁচ ছয় বৎসরকাল পত্নীর সহিত ব্যবহার করিয়া তাহার স্বভাবটা বুঝিতে অনুপমের আর বাকি ছিল না। এই নির্ব্বোধ পত্নীটীর অনেক গুণ থাকা সত্বেও কতকগুলি দোষ, শিক্ষার গুণে এমনই ভাবে তাঁহার অস্থিতে মজ্জাতে জড়িত হইয়া গিয়াছে—যাহা তাঁহার শত তিরস্কার, শত যুক্তিতেও অদ্যাবধি দূর হয় নাই। এবং তাহা দূর হইবার নয় ভাবিয়াই

অনুপম সে চেষ্টা হইতে একেবারেই বিরত হইয়াছিলেন। তাহার উপর বৌদিদির যন্ত্রণায় তিনি তাঁহার পত্নীকে শাসন পর্য্যন্ত করিতে পারিতেন না। পত্নীকে একটু কিছু বলিলেই অমনি সরোজবাসিনী তাহাকে দুশো কথা শুনাইয়া দিতেন। বৌদিদির অসীম স্নেহের তিরস্কারের সম্মুখে অনুপমের মুখ তুলিয়া কথা কহিবার কোন দিনই ক্ষমতা ছিল না, এইজন্যই শশিমুখীর দোষ গুলা বাধা না পাইয়া ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। পত্নীর কথায় অনুপম মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তোমার বয়সের চেয়ে দেখছি, বুদ্ধিটা কিছু বেশী পেকে গেছে। ঠিক ধরেছ তো, যে আমায় ভাল মানুষ পেয়ে ওরা ঠকিয়ে নিচ্ছে। তোমার বিয়েটা আমার সঙ্গে না হয়ে কোন একটা রাজার সঙ্গে হ'লে তার অনেকটা সুবিধে হতো। একটা মন্ত্রীর মাইনে বেঁচে যেত।"

স্বামীর কথায় শশিমুখী ঠোঁট দুইখানি ফুলাইয়া একটু অভিমানজড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "তোমার যদি সব বোঝবার ক্ষমতা থাকতো তা হ'লে কি আর তুমি আমায় এমন করে ঠাট্টা কর! বৌদিদি বল্‌তে তো একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়,—কিন্তু বৌদিদি যে কেন অমন ঠাকুরপো ঠাকুরপো করে তাকি বোঝ! যাদের জন্য অমন সর্ব্বস্ব খরচ করবে তারাই ও রকম কর্ব্বে। ওকি প্রাণের টান ;— দু'দিন টাকা দেওয়া বন্ধ কর দেখি,—দেখি কেমন আদর থাকে ?"

পত্নীর কথায় অনুপমের ক্রোধের বহ্নি যেন তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্র

ভেদ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু তাহা কেবল ঐ এক মুহূর্ত্ত মাত্র। পরক্ষণেই সমস্ত নিবিয়া গিয়া নিদারুণ অন্ধকারে তাঁহার দৃষ্টি, তাঁহার বুদ্ধি তাঁহার চৈতন্যকে পর্য্যন্ত যেন বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিল। তিনি তাঁহার নির্ব্বোধ স্ত্রীর ইহা অপেক্ষা কত বেয়াড়া বেয়াড়া কথা, কত গুরুতর অপরাধ কেবল বৌদিদির কথায় মার্জ্জনা করিয়া আসিতেছিলেন,—তিনি এ কথাটাও তাঁহার মার্জ্জনা করিলেন, অতি দুঃখিত ভাবে বলিলেন, "তুমি এত নির্ব্বোধ যে তোমায় তিরস্কার করাও বিড়ম্বনা। আমার বড় দুঃখ যে তুমি আমার স্ত্রী হয়ে, আমার বৌদিদিকে চিন্‌তে পারলে না। তিনি তোমায় কত ভালবাসেন, যদি বুঝতে, যদি একবার অন্ততঃ বোঝবার চেষ্টাও কর্ত্তে, তা হ'লেও এমন কথা মুখেও আনতে পারতে না। বৌদির মতলবটা তুমি আর আমায় বুঝিও না,—তার সঙ্গে আমার পরিচয়টা তোমার চেয়েও ঢের আগে।"

স্বামীর এই তীব্র কথাগুলার ভিতর কত বড় ভয়ঙ্কর তিরস্কার লুক্কায়িত ছিল তাহা ধারণা করিবার ক্ষমতাও শশিভূষীর থাকিলে, নিশ্চয়ই আর কথা কহিতে পারিতেন না; কিন্তু তিনি অতি তীব্র ভাবে উত্তর দিলেন, "না—চিন্‌তে পারবো কেন,—যত চিনেছ তুমি। যখন এক পয়সা থাকবে না, তখন বুঝতে পারবে বৌদিদিটী কেমন? এই যে শান্তির বিয়েতে এককাঁড়ি টাকা খরচ কর্ত্তে যাচ্ছ,—কেন, তোমার কি দরকার! যাদের মেয়ে তাদের মাথা ব্যথা নয়,—যত মাথাব্যথা পড়ে গেছে ওর।"

অনুপম একবার অতি তীব্র দৃষ্টিতে পত্নীর মুখের পানে চাহিলেন,—এমন সুন্দর সরল মূর্ত্তির ভিতর কেমন করিয়া এমন বিষ সঞ্চিত হইল। তিনি পত্নীর কথায় রাগিবেন না হাসিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অতি সরল ভাবে বলিলেন, "আমার কিসের মাথা ব্যথা, আর কিসের মাথা ব্যথা নয়, তার তত্ত্ব নেবার এখনও তোমার অনেক দেরী। তুমি যা কচ্চো কর, আমি যা কচ্ছি করি, কারণ তুমি আমার তিরস্কারের বাহিরে।"

শশিমুখী শ্লেষ স্বরে উত্তর দিলেন, "তাতো বটেই! আমার চেয়ে ওর বৌদিদি হ'লো আপনার,—তা না হ'লে আর কলিকাল বলে কেন! তুমি যে এমন করে আমার চোখের উপর উচ্ছন্নে যাবে তাতো আর আমি চোখ চেয়ে দেখতে পারবো না।"

অনুপম ক্রমেই বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিলেন,—এই ঘ্যানোর ঘ্যানোরের ভয়েই তিনি গোড়া হইতে বিবাহ করিতে একেবারেই নারাজ ছিলেন। কেবল বৌদিদির অনুরোধে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে এই আপদ ঘাড়ে তুলিতে হইয়াছে। একবার ঘাড়ে তুলিলে আর নামাইবার উপায় নাই; নতুবা এতদিন কি হইত বলা যায় না। সেই জন্যই তিনি বিবাহের সময় তাঁহার বৌদিদিকে বার বার করিয়া বলিয়াছিলেন, "এখন বুঝ্‌চো না বৌদি, এর পর বুঝ্‌বে, পৃথিবীতে সকলেই তোমার মত নয়।"

তবে তাঁহার এই আনন্দ, যে ভোগ তাঁহাকেই কেবল

একলা ভুগিতে হইতেছে না,—বৌদিদিকেও তাহার ভাগ লইতে হইয়াছে। যেদিন পত্নীর অশিষ্ট আচরণ একেবারে গণ্ডির বাহিরে যাইত,—যখন তাঁহার অসীম শিক্ষাও ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিতে চাহিত তখন অনুপম তাঁহার সমস্ত শক্তি,—সমস্ত চেষ্টা একীভূত করিয়া একেবারে নিজেকে নীরব করিয়া ফেলিতেন,—শশিমুখী পাগলের মত যাহা তাহা বলিয়া কোন উত্তর না পাইয়া কেবলই ভিতরে ভিতরে গুমরাইয়া মরিতেন। কিন্তু আজ আর অনুপম নীরব থাকিতে পারিলেন না,—অতি স্পষ্ট—তীব্র শান্ত কণ্ঠে বলিলেন,"যখন বৌদি গা'থেকে একখানি একখানি ক'রে গয়না খুলে দিছ্‌লো তখন তুমি কোথায় ছিলে মণি! কেবল একমুঠো খেয়ে যে এই সংসারে দাসীর মত খাটছে,—বাম্‌ণীর মত রাঁধছে, তাঁর বিরুদ্ধে মুখ নেড়ে কথা কইতে একটু লজ্জা করে না। প্রথম যেদিন এই সংসারের জন্য বৌদি তার হার খুলে এনে দিছ্‌লো সেদিন তার মুখের উপর যে স্বর্গের জ্যোতিঃ ফুটে উঠেছিল তার মহিমা তুমি কি বুঝ্‌বে! যাক্‌,—তোমার সঙ্গে আর আমি বাজে কথা কইতে নারাজ। যদি পার তার পায়ের একটা আঙ্গুলেরও যোগ্য হবার চেষ্টা কর। তুমি আমার স্ত্রী তোমায় বেশী আর কি বল্‌বো,—যে আমার বৌদির নিন্দে আমার সম্মুখে করে আমি তার মুখ দেখতেও ইচ্ছে করি নে।"

ক্রোধে ঘৃণায় অনুপমের কণ্ঠ রোধ হইল,—তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন। স্বামীর এই মর্ম্মান্তিক তিরস্কারে শশিমুখীর সমস্ত

দেহটা ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল,—কথাগুলা ঠিক যেন তীক্ষ্ণ তীরের মত তাঁহার হৃদয়ে যাইয়া বিঁধিল,—তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না। অপমানে অভিমানে তাঁহার দুই চক্ষু হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। চক্ষে অঞ্চল দিয়া ফোঁস ফোঁস করিতে করিতে শশিমুখী শয্যার উপর যাইয়া একেবারে ধড়াস্ করিয়া পড়িলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

—০:*:০—

শশিমুখীর পিতা ভোলানাথ দত্ত কলিকাতার একজন বনিয়াদী বড়লোক। পূর্ব্ব পুরুষের সঞ্চিত অর্থ নাড়িয়া চাড়িয়া পরের দাসত্ব না করিয়াও তাঁহার সংসার বেশ স্বচ্ছন্দতার সহিত চলিয়া আসিতেছিল। তাঁহার দুইটী কন্যা, একটী পুত্র ;—সকলেরই বিবাহ হইয়া গিয়াছে। শশিমুখী তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠাকন্যা,—অসীম স্নেহের পাত্রী। ভোলানাথ দত্তের পত্নী আনন্দময়ী সকলের সম্মুখে স্পষ্টই বলিতেন, যে স্বামীর আদরে আদরে তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যাটীর মস্তক একেবারেই ভক্ষিত হইয়াছে।

বেটেসেটে গৌরবর্ণ স্থূলকায় ভোলানাথ দত্তের মস্তকের সম্মুখেভাগে একগাছিও কেশ ছিল না। বিস্তৃত সাহারার ন্যায় সেই প্রকাণ্ড টাক্‌টা তাঁহাকে গাম্ভীর্য্যের অবতার করিয়া ভিতরটা পর্য্যন্ত একেবারে শুষ্ক নীরস করিয়া দিয়াছিল। তাঁহার মনে মনে একটা দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমান,—সদ্বিবেচক লোক শুধু কলিকাতায় কেন,—সুবিস্তৃত বাঙ্গালা দেশেও এক আধ্‌জন মিলে কিনা সন্দেহ।

বেলা তখন আন্দাজ নয়'টা বাজিয়া গিয়াছে,—ভোলানাথবাবু তাঁহার বৈটকখানা গৃহে বসিয়া একখান দৈনিক খবরের কাগজ

উল্‌টাইতে ছিলেন ; সেই সময় ডাক হরকরা কয়েকখানি পত্র দিয়া গেল। দত্ত মহাশয় তাড়াতাড়ি খবরের কাগজখানা একপার্শ্বে রাখিয়া পত্রগুলি তুলিয়া লইলেন ও গম্ভীরভাবে একখানির পর একখানি পাঠ করিতে লাগিলেন। দুই তিনখানা পত্র পাঠের পর একখানি পত্রে তাঁহার মনটা যেন একটু অধিক ভাবেই আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। পত্রখানা পড়িতে পড়িতে তাঁহার মুখের নানারূপ ভঙ্গি হইতে লাগিল। তিনি পত্রখানা একবার দুইবার তিনবার পাঠ করিলেন,—যতই তিনি সেখানা পাঠ করিতে লাগিলেন ততই তাঁহার গম্ভীর মুখখানা আরও বিশ্রী গম্ভীর ভাব ধারণ করিতে লাগিল। স্থির হইয়া বসিয়া থাকাও তাঁহার পক্ষে বোধ হয় কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইল ;—তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। একটু যেন বিষণ্ণমুখে পত্রখানা হস্তে করিয়া অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

আনন্দময়ী রন্ধন গৃহের সম্মুখে বসিয়া পাচিকাকে রন্ধন সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছিলেন। স্বামীর বয়সের সহিত তুলনা করিলে আনন্দময়ীর বয়স চল্লিশের কম হওয়া কিছুতেই উচিত নয় কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে কিছুতেই তিরিশ পঁয়ত্রিশের অধিক বলিয়া মনে হয় না। পতি ও পত্নীর স্বভাব সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ভোলানাথ দত্তের মুখে যেমন হাসি বলিয়া একটা জিনিষের একেবারেই অভাব ছিল কিন্তু তাঁহার পত্নী আনন্দময়ীর মুখে আনন্দের কোনই অভাব ছিল না ; তিনি সকলের সহিতই হাসিয়া কথা কহিতেন ! তাঁহার সুন্দর নিটোল দেহটীর উপর সৌন্দর্য্যের কোনই অভাব না থাকায়

যে কেহই তাঁহাকে দেখিত সেই যেন কেমন আপনা হইতেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িত। আনন্দময়ী সত্যই তাঁহার আনন্দময়ীর নামের সার্থকতা রাখিয়াছিলেন! সহসা স্বামীকে সম্মুখে দেখিয়া আনন্দময়ী তাঁহার অসংযত বস্ত্র তাড়াতাড়ি সংযত করিয়া লইলেন। স্বামীর নিকট হইতে কিছু শুনিবার আশায় তিনি তাঁহার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিলেন। ভোলানাথ দত্ত পত্নীর দিকে চাহিয়া মাথাটা বেশ একটু নাড়িয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "অনেক দেখেছি,—অনেক শুনেছি তবে বুদ্ধি একটু পেকেছে। সকলেরই যদি বুদ্ধি বিবেচনা থাকৃতো তবে আর ভাবনা কি বলনা। অনেক বুদ্ধি অনেক বিবেচনা তাই এমন কল্‌কাতার মত সহরেও টিকে আছি। একটা ভারিক্কে লোক নেই, ছুটো চ্যাড়া ছোঁড়া—তখনই জানি একটা অসস্তি হবেই। এখন নাও যা বলেছি হরূপে হরূপে মিল্‌লো কি না মিলিয়ে দেখ।"

দিন রাত্রি স্বামীর খটখটে কথাগুলি শুনিয়া শুনিয়া আনন্দময়ীর তাহা একরূপ অভ্যস্থ হইয়া গিয়াছিল। স্বামীর কথায় তিনি কিছুমাত্র আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন না;—শুধু একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আমার আবার কোন কাজটা তোমার বুদ্ধি ছাড়া। কেন কি হয়েছে গা?"

দত্তমহাশয় মুখখানা বেশ একটু সিট্‌কাইয়া বলিলেন, "তখন যে বলে ছিলেম, শ্বশুর নেই, শাশুড়ী নেই—একটা কোন

বুদ্ধিমান ভারিক্কে লোক নেই ওখানে বিয়ে দিয়ে কাজ নেই। তুমি যে একেবারে হেদিয়ে পড়্‌লে,—এখন নাও মজাটা দেখ।"

কথাটা শুনিয়া আনন্দময়ীর বুকের ভিতরটা গুর্ গুর্ করিয়া উঠিল। মুখখানি তাঁহার একেবারে এইটুকু হইয়া গেল। তিনি তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যার জন্য সদাই শঙ্কিত থাকিতেন। সে যে মুখরা—কোনদিন কি বলিতে কি বলিয়া নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই না করিয়া বসে! অমন গুণের স্বামীকে মুখের দোষে পর না করিয়া ফেলে। গ্রহফেরে শ্বশুরালয়ের পবিত্র সম্বন্ধ চিরদিনের মত ঘুচিয়া না যায়। তিনি একটু উৎকণ্ঠিত ভাবে তাড়াতাড়ি বলিলেন, "কেন কি হয়েছে,—শশি বুঝি ঝগড়া করেছে! মেয়ের কথায় তো মোটে আটঘাট নেই। ছেলে বেলা থেকেই ওর বড় বিশ্রী স্বভাব।"

ভোলানাথ বাবু একটু গর্ব্বিত কণ্ঠে বলিলেন, "বড় ঘরের মেয়ে, ওর ওখানে পোষাবে কেন? তখনই আমি জানি,—এখন নাও।"

স্বামীর কথায় আনন্দময়ী রীতিমত ভীতা হইয়া পড়িতেছিলেন, তিনি জড়িত কণ্ঠে তাড়াতাড়ি বলিলেন, "ওখানে পোষাবে কেন,—কি বলছ! স্বামীর ঘর,—শ্বশুরবাড়ী—সেখানে পোষাবে না তো মেয়ে মানুষের পোষাবে কোথায়! তুমিই ত ছেলে বেলা থেকে আদর দিয়ে দিয়ে ওর মাথাটা একেবারে খেয়েছ, তা নইলে কখনও কি ওর অমন স্বভাব হয়।"

পত্নীর কথার মাঝখানেই ভোলানাথ দত্ত মুখখানা বিকৃত

করিয়া বিরক্তভাবে কহিলেন, "তোমার মত মেয়ে মানুষের যদি বুদ্ধি থাকৃতো তা হ'লে আর ভাবনা থাকৃত না। এখন এই নাও, শশি কি লিখেছে শোন।"

এইমাত্র বৈঠকখানা গৃহে কন্যার যে পত্রখানা বার তিনেক পড়িয়া দত্ত মহাশয়ের শুষ্ক মেজাজ একেবারে রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল, সেইখানা আবার পত্নীকে শুনাইবার জন্য তিনি বেশ একটু উচ্চস্বরে পাঠ করিতে লাগিলেন ;—

শ্রীচরণেষু!—

বাবা, আজ দুই তিন দিন আপনাদের কোন সংবাদ পাই নাই,—আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন। এখানে আমার কষ্টের একেবারে অবধি নাই। বড় জা'য়ের দিন রাত খিটখিটিনি আমার একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। একবার আপনাদের ওখানে যাইবার জন্য আমার মন বড় অস্থির হইয়াছে। আপনি যত শীঘ্র পারেন আসিয়া আমাকে লইয়া যাইবেন। আমার প্রণাম গ্রহণ করুন ; ইতি—

সেবিকা—
শ্রীমতী শশিমুখী দাসী।

পত্রখানা পাঠ করা শেষ হইবামাত্র আনন্দময়ী তাড়াতাড়ি বলিলেন "তার বড় জা'য়ের স্বভাব তো তেমন নয়। সে তো বেশ লক্ষ্মী মেয়ে, এই কম বয়সে সংসারের সমস্ত ঝক্কি ঘাড় পেতে নিয়েছে। তোমার মেয়েটির যে ঝগড়া করা স্বভাব।"

ভোলানাথ বাবু অবজ্ঞা ভরে বলিলেন, "সে বোঝ্‌বার বুদ্ধি যদি তোমার থাক্‌তো তা হ'লে আর ভাবনা কি। বাবাজীকে আবার একটু ধমক ধামক করে আস্‌তে হবে দেখ্‌ছি।"

আনন্দময়ীর নিকট তাঁহার স্বামীটির স্বভাব অপরিচিত ছিল না। তিনি জানিতেন কনিষ্ঠা কন্যার ন্যায় তাঁহার স্বামীটিরও মুখের কোন আট ঘাট নাই। তিনি একটু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "জামাইকে ধমকে ধামকে আসবে কিগো! জামাই পুত্র-কুটুম্ব, সে তোমার ধমক ধামকের কি ধার ধারে! কোথায় মেয়েকে বুঝিয়ে সুজিয়ে আসবে, না জামাইকে ধমক ধামক করে আসতে হবে। না—তুমি দেখছি শেষ একটা বিপদ না করে আর ছাড়বে না।"

ভোলানাথ বাবু তাঁহার পাকা কাচা গোঁপটা একবার নাড়িয়া বলিলেন, "একি বুজনো সুজনোর কাজ,—দেখছ ছুটো চ্যাংড়া ছোড়া! নরম হয়েছ কি অমনি মাথায় ওঠে বসেছে। আচ্ছা করে দুটো কড়া কথা শুনিয়ে দিলেই আপনি ঠাণ্ডা হয়ে যাবে!"

আনন্দময়ী স্বামীকে বাধা দিয়া বিষণ্ণ স্বরে বলিলেন "না বাপু তোমার গিয়ে কাজ নেই। আমি বৌমাকে দিয়ে চিঠি লিখে ঝিকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব অখন। এখন তার এখানে আসবার কোন দরকার নেই, যখন তাঁরা পাঠাবেন তখন এলেই পারবে। যখন তখন মেয়ে মানুষের বাপের বাড়ী আসা কি ভাল ?"

দত্ত মহাশয় বিরক্ত ভাবে বলিলেন, "ভাল মন্দ বোঝবার

বুদ্ধি যার তার থাকে! তোমার বুদ্ধিতেই আমার মেয়েটির আজ এই যন্ত্রণা। আমি বিকেলেই যাচ্ছি,—সব কথা শশির মুখে পরিষ্কার ভাবে শুনে, যা হয় একটা ব্যবস্থা করবো। বাবুদের একটু পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে, একটা মেয়েকে দু'মুটো খেতে দেবার সংস্থান আমার যথেষ্ট আছে।"

স্বামীর কথার ভাব ভঙ্গিতে আনন্দময়ী একেবারেই নিরানন্দ হইয়া পড়িয়াছিলেন,—বেশ একটু ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন, "সংস্থান হ'লেই বুঝি মেয়েকে জোর করে এনে বাপের বাড়ী রাখতে হবে। বুড়ো হ'য়ে একেবারে ভীমরতি ধরেছে কি না! বুদ্ধি শুদ্ধি ঘটে একবারে এক রত্তিও নেই।"

পত্নীর কথায় ভোলানাথ দত্ত একেবারে খাপ্পা হইয়া উঠিলেন। বুদ্ধি নাই এ কথাটা তিনি একেবারেই সহ্য করিতে পারিতেন না। সহসা পত্নীর মুখে সেই কথাটা সুস্পষ্ট উচ্চারিত হওয়ায় ক্রোধে তাঁহার চোখ মুখ লাল হইয়া গেল। তিনি কম্পিত কলেবরে কর্কশ স্বরে বলিলেন, "কি বল্লে আমার বুদ্ধি নেই। যার ডাক সাইটে বুদ্ধি কলকাতার সবাই জানে আর তুমি কি না ফস্ করে বল্লে তার বুদ্ধি নেই। একটু নরম পেয়েছ আর অমনি মাথায় উঠে বসেছ। না আজ থেকে আবার ভয়ানক কড়া হতে হবে।"

রাগের ধমকে ভোলানাথ দত্তের মুখ হইতে—আর কথা বাহির হইল না। তিনি পাগলের মত হাত পা নাড়িয়া একেবারে বৈটকখানার দিকে চলিয়া গেলেন। কথাটা ফস্ করিয়া মুখ

হইতে বাহির হইয়া যাওয়ায় আনন্দময়ীও একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিলেন,—তিনি জানিতেন তাঁহার স্বামী বুদ্ধিহীন-কথাটা একেবারেই পছন্দ করিতেন না। তাই তিনি অন্য একটা কথা পাড়িয়া কথাটা চাপা দিবার চেষ্টায় ছিলেন কিন্তু ফুরসৎ পাইবার পূর্ব্বেই ভোলানাথ দত্ত চলিয়া গেলেন। স্বামীর গমনের ভাব দেখিয়া, আনন্দময়ীর কন্যার জন্য আশঙ্কায় বুকের ভিতরটা থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আগামী শনিবারে শান্তির পাকা দেখা হইবে,—অনুপম তাহাই লইয়া একেবারে মাতিয়া গিয়াছিলেন। বিবাহেরও আর বেশী দিন নাই,—অলঙ্কার প্রস্তুত, বিবাহের প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র খরিদ প্রভৃতি লইয়াই তিনি ব্যতিব্যস্ত। পত্নীর বিষয় চিন্তা করিবার আর তাঁহার মোটেই অবসর ছিল না। সেই রাত্রের পর হইতে পত্নীর সহিত তাহার আর কোন বিশেষ কথাবার্ত্তা হয় নাই? সে দিনকার কথাবার্ত্তাগুলি তিনি একরূপ ভুলিয়া গিয়াছিলেন কিন্তু শশিমুখী ভুলিতে পারেন নাই—তিনি স্বামীর আচরণে একেবারে মরমে মরিয়া ছিলেন। সেই হইতে তিনি আর নিজের শয়ন কক্ষ হইতে প্রায়ই বাহির হইতেন না, দিনরাত্রি কোন না কোন একখানা উপন্যাস মুখে দিয়া পড়িয়াছিলেন! কেবল সরোজবাসিনীর যেন মহা অনিচ্ছা সত্ত্বে আহারের সময় বিরক্তিজনক সাধাসাধি ডাকা-ডাকির জ্বালায় তাঁহাকে একবার করিয়া নীচে নামিতে হইত।

আজও একখানা উপন্যাস লইয়া তিনি তাঁহার গৃহের মেজের উপর পড়িয়াছিলেন। তখন বেলা অনেক হইয়াছে,—সূর্য্যের প্রখর কিরণে চক্ষু পাতিবার উপায় নাই! বারান্দার উপর তীব্র

রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। কাপড় কাচিয়া যাইবার জন্য সরোজ-বাসিনী ক্রমাগত ডাকিয়া পাঠাইতেছিলেন কিন্তু সেকথা তাঁহার কর্ণেও প্রবেশ করে নাই। পরীক্ষার্থী ছাত্রের পাঠ্য পুস্তকের ন্যায় একান্ত মন-সন্নিবেশ করিয়া তিনি উপন্যাসখানি গলাধঃকরণ করিতে-ছিলেন। সেই সময় মহা ব্যস্তভাবে অনুপম আসিয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন। অলঙ্কারের জন্য স্যাকরাকে টাকা দিতে হইবে,—তাই তাঁহাকে উপরে আসিতে হইয়াছিল। গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া পত্নীকে এত বেলা পর্য্যন্ত একখানা উপন্যাস মুখে দিয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া রাগে তাহার ব্রহ্মতালু পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিল। যখন বাটীর সকলেই যে যাহার কার্য্যে ব্যস্ত, তখন শশিমুখী শয্যার উপর আড় হইয়া পড়িয়া উপন্যাস পাঠ করিতে-ছেন। পত্নীর মুখের দিকে চাহিতেও অনুপমের ঘৃণা বোধ হইল। তিনি নীরবে আপন মনে বাক্স খুলিয়া অর্থ বাহির করিতে লাগিলেন।

অনুপমকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া শশিমুখী উঠিয়া বসিয়াছিলেন কিন্তু একটা পরিচ্ছেদের আর একখানা পাতা বাকি আছে সেটা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি কথা কহিতে পারিতেছিলেন না। কিন্তু কথা না কহিলেও নয়;—তিনি তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য পিতাকে পত্র লিখিয়াছেন,—স্বামীর একটা হুকুম লওয়া আবশ্যক। অনুপম পত্নীর দিকে লক্ষ্য না করিয়াই অর্থ লইয়া বাহির হইয়া যাইতেছিলেন সেই সময় পত্নীর স্বর তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল, "শোন, কাল আমি বাপের বাড়ী যাবো।"

পত্নীর স্বর কর্ণে যাওয়ায় অনুপম দাঁড়াইয়াছিলেন,—তিনি ফিরিলেন গম্ভীরভাবে বলিলেন, "বেশ,—ভাল কথা। তা আমায় জিজ্ঞেসা করবার প্রয়োজন কি ?"

শশিমুখী বিষণ্ণস্বরে বলিলেন, "প্রয়োজন যে কিছু নেই তা আমি জানি,—আমি যে তোমার একটা আপদ বালাই তা আর আমার বুঝ্‌তে বাকি নেই। বালাই বিদেয় হলেই তুমি বাঁচ,—তা ভালোয় ভালোয় বিদেয় হওয়াই ভাল।"

গৃহে প্রবেশ করিয়াই অনুপম পত্নীর উপর বিশেষ বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন ;—গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "নিশ্চয় ! যখন যাওয়াই স্থির, তখন ভালোয় ভালোয় যাওয়াই ভালো।"

শশিমুখী ঠোঁট দুইখানি ফুলাইয়া অভিমান জড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "কাল বাবা আমায় নিতে আসবেন তখন যেন আবার বোলোনা 'যাওয়া হবেনা।"

"আমি তো তোমার পাঠাবার মালিক নই। যে তোমাকে এনেছেন তাঁর কাছে যাও। বৌদি যদি হুকুম দেয় তোমার যেখানে খুসি চলে যেতে পার,—আমার কোন আপত্তি নেই," এই কয়টা কথা অতি বিরক্তভাবে বলিয়া অনুপম গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। শশিমুখী শয্যার উপর বসিয়া মুখখানা ভার করিয়া রাগে গজ গজ করিতে লাগিলেন।

রন্ধনগৃহে সরোজবাসিনী উনানে দুধ জ্বাল দিতেছিলেন,—শান্তি সম্মুখে বসিয়া কুটনো কুটিতেছিল। সেই সময় শশিমুখী

আসিয়া সিক্তবস্ত্রে রন্ধন গৃহের চৌকাটের বাহিরে দাঁড়াইলেন। শশিমুখীকে রন্ধনগৃহের সম্মুখে দাঁড়াইতে দেখিয়া শান্তি কথা কহিল, বলিল, "কাকীমার বুঝি—এতক্ষণে কাপড় কাচা হ'লো!"

শশিমুখী কোন উত্তর দিলেন না। একবার শুধু শান্তির মুখের দিকে তীব্রভাবে চাহিয়া চক্ষু নত করিলেন। কন্যার কথায় সরোজবাসিনী ঘাড় ফিরাইলেন। রন্ধনগৃহের দ্বারের সম্মুখে সিক্ত-বস্ত্রে শশিমুখীকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন, "ভিজে কাপড়ে আবার দাঁড়িয়ে রইলে কেন ছোটবৌ। শিগ্‌গির কাপড় ছেড়ে ফেল গে যাও। শেষ আবার একটা অসুখ বিসুখ বাধাবে।"

বড় জা'য়ের কথায় ছোটবৌ তাহার সুন্দর মুখখানি একেবারে বিকৃত করিয়া নাকিস্বরে বলিলেন, "কাল আমি বাপের বাড়ী যাব তাই বলতে এলুম।"

ছোটবৌএর কথায় সরোজবাসিনী যেন একটু উৎকণ্ঠিতা হইয়া পড়িলেন, ছোটবৌএর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হঠাৎ বাপের বাড়ী যাবে কেন? কারুর কি অসুখ বিসুখ হয়েছে নাকি?"

শশিমুখী মুখখানি ভার করিয়া বলিলেন, "না।"

সরোজবাসিনী যেন একটু বিস্মিতভাবে বলিলেন, "তবে?"

কিন্তু এই তবের উত্তর যাহা তাহা শশিমুখীর বলা অসম্ভব। তিনি নীরবে হেটমুখে পদনখে মৃত্তিকা খনন করিতে লাগিলেন।

শান্তি তাহার কাকীমার দিকে মুখ তুলিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "কাকীমার বুঝি রাগ হয়েছে।"

সরোজবাসিনী কন্থার কথায় মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "এযে তোমার অন্যায় রাগ ছোটবৌ। স্ত্রী দোষ কল্লে স্বামী বকেই থাকে, তাই বলে কি আর সবাই বাপের বাড়ী চলে যায়। শনিবারে শান্তির পাকা দেখা,—কাল কি আর তোমার বাপের বাড়ী যাওয়া হয়।"

অনুপমের কথাগুলার তীব্র জ্বালা তখনও শশিমুখীর ভিতরটা পুড়াইয়া দিতেছিল ;—তিনি আর নীরব থাকিতে পারিলেন না। ক্রুদ্ধা সর্পিণীর ন্যায় মাথা তুলিয়া গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "আমারতো সবই অন্যায়। কথায় বলে যাকে দেখ্‌তে পারিনি তার চলন্‌ বাঁকা। আমারই সব দোষ ;—দরকার কি আমার,—আমি কাল বাপের বাড়ী চলে যাচ্ছি, যাঁরা সব ভাল, তারাই জন্ম জন্ম থাকুন।

সরোজবাসিনী অতি মধুরস্বরে বলিলেন, "এখনও কি অমন ছেলে মানুষের মত অবুঝ হওয়া ভাল। এখন বয়েস হয়েছে, এখনও যদি একটু ধীর শান্ত না হও, লোকে যে তোমার নিন্দে করবে।"

শশিমুখী বিকৃতকণ্ঠে বলিলেন, "বুঝি সব,—আমিতো গেলেই তোমাদের ভালো হয়। ওর টাকাগুলো দুহাতে নয় ছয় কর্ত্তে পায়। নিজের স্বামীর রোজগারের টাকা যদি হতো, তা'হলে বুঝতে পার্‌তে। পরের টাকা খরচ কর্ত্তে একটু লজ্জা করেনা।"

সরোজবাসিনী ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন,—তিনি সব সহ্য করিতে পারিতেন,—কিন্তু স্বামী সম্বন্ধে একটু কিছু কথা হইলেই তাঁহার ভিতরটা একেবারে ফুলিয়া উঠিত। স্বামীর মর্য্যাদায় আঘাত লাগায় সরোজবাসিনীর ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। কি কথায় কি কথা আসিয়া পড়িল,—তিনি একটু রুক্ষ স্বরে বলিলেন, "তুমি না হয় বড় লোকের মাগ,—বড় লোকের মেয়ে, তা বলে অত অহঙ্কার ভাল নয় ছোটবৌ। স্বামীর পয়সায় যদি এতই দরদ, তাকে বলতে পারো না, তোমায় নিয়ে পৃথক হয়ে থাকেন। তার সঙ্গে ঝগড়া না করে আমার সঙ্গে ঝগড়া কর্ত্তে এসো কেন।"

ছোটবৌ চিমটি কাটিয়া কহিলেন,—"তুমিই ত যত নষ্টের গোড়া,—তুমি যে তাকে ওষুধ করেছ।"

দুঃখে ঘৃণায় সরোজবাসিনীর নয়ন ফাটিয়া অশ্রু বাহির হইবার মত হইল ;—তিনি অশ্রু-জড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "যা নয় তাই তুমি যখন তখন বল্‌তে এস কিসের জন্য বল তো ছোটবৌ! আমি অনেক সহ্য করেছি, আর সহ্য করবো না ; আজই যা হক, এর একটা হেস্তনেস্ত করবো।"

শশিমুখী চীৎকার করিয়া বলিলেন, "সহ্য না করলেই তো বাঁচি,—বিদেয় হলে ওর ঘাড় থেকে শনি নেমে যায়। খাবেন, নেবেন—আবার মুখ নেড়ে ঝগড়া করবেন।"

সরোজবাসিনীর মুখখানা একেবারে ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছিল, তাঁহার ওষ্ঠাধর বারম্বার কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি দাঁত

দিয়া অধর চাপিয়া ধরিয়া, নিজেকে একটু সংযত করিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "তখন তুমি কোথায় ছিলে ছোট বৌ, যখন বাপ মরবার পর নিজে না খেয়ে ভাইকে খাইয়ে ছিলো,—যখন দিনরাত খেটে, এই সংসারটা বজায় রাখতে একটু নিঃশ্বাসও ফেলবার অবসর নেয়নি।"

সেই সময় কি কাজের জন্য অনুপম বাড়ীর ভিতর আসিয়াছিলেন, রন্ধন গৃহের সম্মুখে এই ব্যাপার দেখিয়া তিনি একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। দেবরকে সম্মুখে দেখিয়া সরোজবাসিনীর দরদর্ করিয়া দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। তিনি অঞ্চলে অশ্রু মুছিতে মুছিতে দেবরকে সম্বোধন করিয়া গাঢ় স্বরে বলিলেন, "না ঠাকুরপো, তোমরা আর কোথাও গিয়ে থাকগে যাও, আর না হয় বৌটিকে বিদেয় কর,—আমার আর সহ্য হয় না; তা আজ স্পষ্ট বলে দিলুম। কথায় কথায় উনি যে ওঁর খাচ্ছি পরছি বলে খোঁটা দেবেন—এ আমার অসহ্য।"

বৌদিদির নয়নে অশ্রু দেখিয়া অনুপম ক্রোধে একেবারে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। তিনি আর একটু হইলেই একটা কিছু ভয়ঙ্কর কথা বলিয়া ফেলিতেন; ঠিক সেই সময় অপূর্ব্ব আসিয়া উঠানের মধ্য স্থানে দাঁড়াইলেন। ভাসুরকে দেখিয়া শশিমুখী ঘোমটা টানিয়া রন্ধন গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন,—অনুপমও নিজের সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত করিয়া নিজেকে সংযত করিয়া ফেলিলেন।

অপূর্ব্ব গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিলেন, "বড়বৌ"।

স্বামীর কণ্ঠস্বর সরোজবাসিনীর কর্ণে যাওয়ায় অভিমান-ঝটিকা তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে ক্ষুব্ধ সাগরের মত উত্তাল হইয়া উঠিল। তাঁহার কণ্ঠ হইতে আর একটিও বাক্য বাহির হইল না। প্রবল অশ্রু ধারা সমস্ত কথা ভাসাইয়া লইয়া তাঁহাকে একেবারে নির্ব্বাক করিয়া দিল। অপূর্ব্ব ধীরে ধীরে পত্নীর সম্মুখে আসিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "এই যদি না সহ্য কত্তে পারবে বড়বৌ,—তবে বড় হয়ে ছিলে কেন ?"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

স্বামী ও দেবরের সম্মুখে এত বড় কাণ্ডটা হওয়ায় সরোজ-বাসিনী লজ্জায় একেবারে মরিয়া যাইতেছিলেন। লোকের সম্মুখে মুখ দেখাইতে তাঁহার লজ্জা বোধ হইতেছিল। স্বামী'র কথাটা যেন শত ধিক্কার দিয়া তথনও তাঁহার কর্ণের' ভিতর ঝম্ ঝম্ করিয়া বাজিতেছিল। সহগুণের জন্যই যে নারী জগতের আদর্শ! তিনি তাঁহার অশেষ স্নেহের পাত্রী,—নিজের কনিষ্ঠা জায়ের দুইটা কঠিন কথাও সহ্য করিতে পারিলেন না! ইতর স্ত্রীলোকের স্থায় ছোটজা'য়ের সহিত বচসায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ছি ছি, ইহা অপেক্ষা আর তাঁহার অধিক কি অধঃপতন হইতে পারে! তাঁহার মনে হইতেছিল, যে কালী তিনি সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সমস্ত দেহটা একেবারে কালো হইয়া গিয়াছে—তাহা যেন আর লোকের সম্মুখে বাহির করা যায় না। তাই তিনি নিজেকে লোকের সম্মুখ হইতে দূরে রাখিয়া নীরবে সংসারের কাজগুলি সারিয়া যাইতে ছিলেন। বিশ্বব্যাপী বিরাট ঝঞ্ঝার পর সমস্ত পৃথিবী যেমন ওলট পালট হইয়া যায়, সরোজবাসিনীর ভিতরটাও আজ যেন সেইরূপ একটা আকস্মিক ঝঞ্ঝায় একেবারে চূর্ণ

বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। শান্তি আসিয়া সংবাদ দিল, "মা কাকীমা থাবে না।"

সরোজবাসিনী অপরাধীর ন্যায় মুখ তুলিয়া চাহিলেন,—যেন তাঁহারই সমস্ত দোষ। অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, "থাবে না কেনরে? একটু বুঝিয়ে সুজিয়ে ডেকে নিয়ে আয় না। বল্, মা বল্লে,—"ছি, রাগ কর্ত্তে আছে?"

শান্তি মুখখানা একটু বেশ ভারিক্কের মত করিয়া বলিল, "আমি বুঝি তা বলিনি। কত বল্লুম,—কাকীমা বুঝি তা শোনে!"

কন্যার কথায় সরোজবাসিনী অপ্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "আবার যা বলছি,—বলগে যানা।—তুই বড় কথা ঘ্যাঁচড়া।"

মায়ের অপ্রসন্ন ভাব লক্ষ্য করিয়া শান্তি আর কোন কথা কহিল না,—সে তাহার কাকীমাকে ডাকিবার জন্য উপরে চলিয়া গেল।

ভাসুর চলিয়া যাইবার পর শশিমুখী রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া মুখখানা হাঁড়ীর মত করিয়া একেবারে যাইয়া শয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বেলা তিন প্রহর হইতে চলিল তথাপি তিনি আহারের জন্য নীচে নামেন নাই। সকলের আহার হইয়া গিয়াছে, সরোজবাসিনী কেবল তাঁহারই জন্য রন্ধন গৃহে হাঁড়ী কোলে করিয়া বসিয়া আছেন, আর কন্যাকে দিয়া ক্রমান্বয়েই শশিমুখীকে ডাকিয়া পাঠাইতেছিলেন। কিন্তু শশিমুখী ধনুষ্টঙ্কারের রুগীর মত শয্যায় পড়িয়া প্রতি ডাকে আঁকিয়া বাঁকিয়া ফোঁস ফোঁস করিয়া

উঠিতেছিলেন। এত বড় একটা কাণ্ডের পর ছোটজা রাগ করিয়া অনাহারে পড়িয়া আছে,—সরোজবাসিনী কোন্ লজ্জায় আহারে বসিবেন! কাজেই তাঁহাকেও অনাহারে ছোটজা'য়ের অপেক্ষায় রান্নাঘরে বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল। অন্যদিন তিনি নিজেই শশিমুখীকে' ডাকিয়া আনেন, কিন্তু আজ আর তিনি নিজে কিছুতেই তাহাকে ডাকিতে যাইতে পারিতেছিলেন না। কেমন যেন একটা সঙ্কোচভাব আসিয়া তাঁহার চলৎশক্তি রহিত করিয়া দিয়াছিল।'

অনুপম শান্তির পাকাদেখার জিনিষপত্র খরিদ করিতে বড়-বাজারে গিয়াছিলেন, যখন বাটী ফিরিলেন তখন বেলা প্রায় তিনটা। মুটে সহ বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া সরোজবাসিনীকে তখন পর্য্যন্ত রান্নাঘরে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, তিনি একেবারে অবাক হইয়া গেলেন। একটু বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৌদি, তোমার এখনও খাওয়া হয়নি? এত বেলা অবধি উপোস করে বসে আছ?"

দেবরের কথায় সরোজবাসিনী উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না। একটু সঙ্কুচিত ভাবে বলিলেন, "কাজ কর্ম্ম সারতে একটু বেলা হয়ে গেল।"

অনুপম বিরক্তভাবে বলিলেন, "তোমার কাজকর্ম্ম আর কিছু-তেই সারা হবেনা,—বেলা কত হয়েছে তা হুস আছে! নাও শিগ্‌গির খেয়ে নাও, আর দেরী করোনা।"

দেরী করিবার যথার্থ কারণটা দেবরের নিকট বলিতে সরোজবাসিনীর বাধ বাধ ঠেকিতেছিল,—সেই সময় শান্তি আসিয়া বলিল, "না মা,—কাকীমা কিছুতেই এলোনা।"

বৌদিদি যে এত বেলা পর্য্যন্ত কেন আহার করিতে পারেন নাই, শান্তির কথায় তাহা অনুপমের নিকট পরিষ্কার হইয়া গেল। জননীতুল্যা বড় জা'য়ের মুখের উপর অপমান জনক ইতরের মত যাহা তাহা বলিয়া,—কোথায় পায়ে ধরিয়া মার্জ্জনা ভিক্ষা করিবে,—তাহা নয় আবার রাগ করিয়া শুইয়া আছে। আর সেই বড় জা, যে সে কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়া তাহারই অপেক্ষায় অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত অনাহারে বসিয়া আছেন। এই ব্যাপারটা অনুপমের চক্ষে মহা বিসদৃশ ঠেকিল। তিনি পত্নীর এই সকল ঘৃণিত আচরণ কি কষ্টে যে সহ্য করিতেন, তাহা কেবল অন্তর্য্যামীই জানেন। তিনি ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন, "বৌদি এখনও বল্‌চি বিদেয় কর। যদি আমায় লক্ষ্মীছাড়া কর্ত্তে না চাও, তবে অলক্ষ্মীটাকে আগে বিদেয় কর।"

দেবরের কথার মধ্যপথেই বাধা দিয়া সরোজবাসিনী একটু কিন্তু ভাবে বলিলেন, "ছি ঠাকুরপো,—তুমি বিদ্বান, বুদ্ধিমান,—ছেলেমানুষ যদি না বুঝে কোন দোষ করে, তা বলে কি তার উপর তোমার রাগ করা উচিত। যাও লক্ষ্মীটি, একটু ভাল করে বুঝিয়ে সুজিয়ে পাঠিয়ে দাও গে।"

অনুপমের মেজাজ একেবারেই বিশ্রী হইয়া গিয়াছিল,—তিনি

গম্ভীরভাবে বলিলেন, "যে-মায়ের সমান বড় জাকে অপমান কর্ত্তে পারে তার অসাধ্য কিছুই নেই। না বৌদি, আমি তার সঙ্গে কথা কইতে একেবারেই নারাজ।"

সরোজবাসিনী অতি মিনতির স্বরে বলিলেন, "এই কথাটা আমার রাখ ঠাকুরপো। তুমিতো আমার কোন দিন কোন কথা ঠেলনি।"

সরোজবাসিনীর এই মিনতিপূর্ণ কথা কয়টী শুনিয়া,—তাঁহার সজল নয়নের প্রতি চাহিয়া অনুপম আর কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না। নীরবে উপরে চলিয়া গেলেন। তিনি যখন গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন তখন তাঁহার প্রাণের ভিতর ভক্তি ও স্নেহ মেশামিশি হইয়া ছাপাইয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল। গৃহের ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার দৃষ্টি পালঙ্কোপরিস্থিত তাঁহার পত্নীর উপর পতিত হইল। অনুপম গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিলেন, "ওগো বড়মানুষের মেয়ে,—অনুগ্রহ করে দুটো বদনে দিয়ে আসুন। আপনার জন্যে কতকক্ষণ আর লোকে হেঁসেল নিয়ে বসে থাক্‌বে।"

শশিমুখী গবাক্ষের দিকে চাহিয়া বিশুষ্ক মুখে পড়িয়াছিলেন,—স্বামীর কণ্ঠস্বর কর্ণে যাওয়ায় তাঁহার সংযত বস্ত্র আর একবার ভাল করিয়া সংযত করিয়া লইলেন, অবগুণ্ঠনে বদন ঢাকিয়া যেন মহাকষ্টে উঠিয়া বসিলেন। একটুখানি সরিয়া আসিয়া সহসা যেন তাঁহার দেহটা একেবারে জাম হইয়া গেল। তিনি খাটের বাজু ধরিয়া

রাজহংসীর ন্যায় ঘাড় বাঁকাইয়া অন্যদিকে মুখ করিয়া রহিলেন। সহসা মনুষ্যের স্বর পাইলে ব্যাঘ্র যেমন ওৎ পাতিয়া বসে, শশিমুখীও যেন সেইরূপ একটু জুত করিয়া বসিলেন। পত্নীকে উঠিতে দেখিয়া অনুপম ভাবিয়াছিলেন, শশিমুখী বুঝি বা স্বামী-ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইবার জন্য বিনা বাক্যব্যয়ে স্বামীর আদেশ মাথা পাতিয়া লইলেন, কিন্তু তাহার ঘাড় বাঁকাইয়া বসিবার ভঙ্গিমা দেখিয়া মুহূর্ত্তে তাঁহার সে ধারণা তিরোহিত হইল। সাধুর বচন মিথ্যা হইবার যো কি ;—'ভোবি ভুলিবার নয়'। অনুপম পত্নীকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া পুনরায় বলিলেন, "আবার বসলেন কেন'—উঠুন,—গুটি গুটি করে গিয়ে—দুটি খেয়ে মাথা রক্ষে করুন।"

শশিমুখী একবার বঙ্কিম ভাবে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া, "না আমি খাব না," বলিয়া আবার মুখ ফিরাইলেন।

অনুপম বিকৃত কণ্ঠে বলিলেন, "কেন! দেহ, কি নাড়তে কষ্ট বোধ হচ্ছে। আমায় কি ভাত বেড়ে এনে মুখের গোড়ায় ধরতে হবে। তা আপনি বসুন,—আমি যাই, ভাত বেড়ে নিয়ে আসি।"

শশিমুখীর ঠোঁট দুইখানি ফুলিয়া উঠিল,—চোক মুখ ঘুরাইয়া বলিলেন, "যাও,—আমার ভাল লাগে না। কেন আমায় বিরক্ত কচ্ছো।"

অনুপম তাড়াতাড়ি বলিলেন, "বুঝতে পারিনি,—ঝকমারি

হয়েছে! তা গতর থাক্‌বে কিসে? না খেলে, এমন মধুরবাণী যে হ'রে যাবে। কোমর বেঁধে হাত পা নাড়বে কেমন করে?"

অন্ধকার রাত্রে সহসা সর্পের ল্যাজে পা দিলে সে যেমন ফোঁস করিয়া উঠে, শশিমুখীও সেইভাবে ফোঁস করিয়া উঠিলেন, "না আমি খাবো না,—কিছুতেই খাবো না। যদি আজ আমি খাইতো"—

অনুপম তাড়াতাড়ি যাইয়া পত্নীর মুখের উপর হাত দিয়া কথাগুলো যেন চাপিয়া ধরিলেন। গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "আর 'তোয়ে' কাজ নাই। 'তো' যা তা বেশ বুঝতে পেরেছি। এখন যাও দেকি—লক্ষ্মীটির মত খেয়ে এসো দিকি?"

শশিমুখী স্বামীর কথায় আর কোন উত্তর দিলেন না। তাঁহার দেহটা যেন শক্তিহীন হইয়া আপনা হইতেই বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িল। তিনি আবার শয্যার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া বালিশের ভিতর মুখ লুকাইলেন। অনুপম কেবল বৌদিদির অনুরোধেই এতক্ষণ কোন ক্রমে নিজেকে সংযত রাখিয়াছিলেন, কিন্তু পত্নীকে আবার শয্যার উপর পড়িতে দেখিয়া তাঁহার মেজাজ একেবারে বিগ্‌ড়াইয়া গেল,—তিনি বিষম বিরক্ত ভাবে বলিলেন, "না,—এ একেবারে বিরক্তিজনক! এর ওষুধ হচ্ছে আগাপাছতলা সপা-সপ চাবুক। কিন্তু নিজেকে যখন ভদ্রলোক বলে পরিচয় দিতে হবে, তখন তার আর উপায় নেই, কাজেই সহ্য কর্ত্তে হবে।"

সোডার বোতল সহসা ভাঙ্গিয়া যাইলে তাহার গুলিটা যেমন ছুটিয়া আইসে, শশিমুখীও ঠিক সেইভাবে ঠিকরাইয়া উঠিলেন। কাঁদিয়া ফুলিয়া হাত পা নাড়িয়া, অশ্রু-জড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "সহ্য করার দরকার কি,—মার না—মার! সব হয়েছে ওটাই বা আর বাঁকি থাকে কেন?"

সহসা এরূপ ভাবে শশিমুখী ঝাঁপাইয়া উঠায় অনুপম একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। শশিমুখী আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু সরোজবাসিনীকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি অবগুণ্ঠনটা টানিয়া দিয়া নীরব হইলেন। সরোজবাসিনী ধীরে ধীরে শশিমুখীর সম্মুখে আসিয়া তাঁহার হাত দুইখানি ধরিয়া অতি কোমল স্বরে বলিলেন, "ছিঃ ছোটবৌ, বড় জা'য়ের কথায় কি রাগ কত্তে আছে। চল—খাবে চল।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

—:•:—

রাগ হইলে প্রাণের ভিতরে একটা ঝটিকা প্রবাহিত হইতে থাকে, সেটা ক্রমাগতই কণ্ঠনালি চাপিয়া ধরে,—তাহাতে আহার করিতেও ইচ্ছা হয় না,—কথা কহিতেও বিরক্ত বোধ হয়। কেমন যেন সমস্ত দেহটা ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে থাকে। শশিমুখীরও তাহাই হইল,—বড় জা'য়ের কাতর মিনতি বারবার উপেক্ষিত ও অপমানিত হইয়াও অপ্রতিহত থাকায়, শেষে তাঁহাকে বিরক্ত হইয়া আহার করিতে যাইতে হইল বটে, কিন্তু রাগের প্রচণ্ড প্রবাহে কণ্ঠনালি আবদ্ধ থাকায়, ভাত কিছুতেই ভিতরে যাইতে চাহিল না। তিনি নামমাত্র আহারে বসিলেন বটে; কিন্তু কিছু আহার করিলেন না। অতি সত্বর আহার শেষ করিয়া আবার আসিয়া শয্যায় পড়িলেন।

একাকী শয্যায় পড়িয়া পড়িয়া নানাবিধ চিন্তায় তিনি উৎপীড়িত হইতে লাগিলেন। বায়োস্কোপের ছবির মত মান অভিমানের অপরূপ চিত্র সকল নাচিয়া নাচিয়া ক্রমাগতই তাঁহার নয়নের সম্মুখে দিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। মৃদু ও তীব্র নিঃশ্বাস মাঝে মাঝে নাসিকা পথে বাহির হইয়া দেহটা কতকটা হাল্কা করিয়া দিতেছিল বটে; কিন্তু তাহা মুহূর্ত্তের জন্য; পরক্ষণেই আবার কতকটা

বদ্ হাওয়া বুকের গোড়ায় জড় হইয়া সমস্ত প্রাণটাকে যেন অস্থির করিয়া তুলিতেছিল। এই চিন্তা দোলায় দুলিতে দুলিতে অলক্ষ্যে তাঁহার চক্ষু মুদিয়া গিয়াছিল, তিনি নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। শান্তির ডাকে যখন তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল তখন একেবারে সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। কলিকাতার হর্ম্ম্যশিখরপুঞ্জের উপর দিয়া নিঃশব্দে গোধূলিরাণী আপন অপরূপ মায়ামন্ত্র বিকীর্ণ করিয়া সন্ধ্যার ছায়ায় নিজ কায়া মিশাইয়া দিতেছিলেন। ঘরের আসে পাশে পালঙ্কের নিম্নে সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমেই গাঢ় হইয়া উঠিতেছিল। শশিমুখী চক্ষু মেলিয়া সন্ধ্যার ম্লান ছায়া দেখিয়া চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন। সন্ধ্যা হইয়াছে, না উষা সমাগম—তাহা বুঝিবার জন্য তিনি একটু ব্যাকুল ভাবে গৃহের চারি দিকে চাহিতে লাগিলেন। সহসা গাঢ় নিদ্রায় অবিভূত হইয়া পড়ায় তিনি অনেক কথাই ভুলিয়া গিয়াছিলেন,—ক্রমে ক্রমে একটু স্থির হইয়া চিন্তা করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার একে একে সমস্ত কথাই মনে হইতে লাগিল। তিনি রাগের লক্ষণগুলা আবার যেন জোর করিয়া মুখে চোখে ফুটাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

শান্তি বহুক্ষণ হইতেই তাহার কাকীমাকে ডাকিতেছিল,—এতক্ষণে তাঁহাকে নড়িয়া চড়িয়া উঠিয়া বসিতে দেখিয়া সে মৃদু হাসিয়া বলিল, "কাকীমা, তোমার কি আর ঘুম ভাঙ্গে না,—সন্ধ্যা কখন হ'য়ে গেছে। এদিকে আমি ডেকে ডেকে মরছি। তোমার বাবা এসে কতক্ষণ বসে আছেন। বাবা! কি ঘুম তোমার!"

পিতার আগমন বার্ত্তা পাইয়া শশিমুখী যেন একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি পালঙ্ক হইতে নামিয়া পড়িলেন,— মৃদুস্বরে বলিলেন, "যা তো শান্তি, আমার ঘরের আলোটা শিগ্‌গির জেলে নিয়ে আয়। আমি ততক্ষণ চুলটা বেঁধে কাপড়টা ছেড়ে ফেলি।"

শান্তি হাসিতে হাসিতে বলিল, "বাঃ বেশ মজার কথাতো! আর তোমার বাবা বুঝি বাইরে একলা বসে থাক্‌বেন?"

শশিমুখী একটু বিস্মিতের ন্যায় প্রশ্ন করিলেন, "কেন,—বাইরে কি কেউ নেই?"

শান্তি মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল, "কাকাবাবু ত সেই কখন বেরিয়ে গেছেন,—বাবা ত এখনও আসেন নি; বাহিরে কে থাক্‌বে বল?"

শশিমুখীর মুখখানি একটু গম্ভীরভাব ধারণ করিল,—তিনি সেইভাবেই বলিলেন, "তুই আলোটা আগে নিয়ে আয়,— তারপর গিয়ে বাবাকে ডেকে আন্‌বি। আমি ততক্ষণ চুলটা বাঁধি।"

"সন্ধ্যেবেলায় চুল বাঁধা,—কাকীমার যত সব অলক্ষণে কাণ্ড," বলিয়া শান্তি আলো আনিতে চলিয়া গেল। শশিমুখী একবার অবজ্ঞা ভরে তাহার দিকে চাহিয়া চুল বাঁধিবার জন্য আরসির সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার সুন্দর গৌরবর্ণ মূর্ত্তি দর্পণের উপর প্রতিফলিত হইল। মূর্ত্তির পানে চাহিয়া তিনি একবার ঠোঁট ফুলাইলেন।

তাহার পর তাড়াতাড়ি চিরুণী বাহির করিয়া তাঁহার সেই ঘন কৃষ্ণ চুলের গোছাটা ধীরে ধীরে আঁচ্‌ড়াইতে লাগিলেন।

শান্তি আলো লইয়া উপস্থিত হইল। এতক্ষণ শশিমুখী একরূপ অন্ধকারেই চুল আচ্‌ড়াইতেছিলেন ও চুল বাঁধিবার দড়ি ফিতা প্রভৃতি সরঞ্জাম গুলো হাতড়াইতেছিলেন। শান্তি আলো আনায়, ঘরখানা যেন অন্ধকারের ভিতর হইতে গাঝাড়া দিয়া পরিষ্কার হইয়া দাঁড়াইল। শশিমুখী তাড়াতাড়ি চুল বাঁধিবার সরঞ্জামগুলি বাহির করিতে করিতে শান্তিরদিকে ফিরিয়া বলিলেন," এইবার যা, বাবাকে ডেকে নিয়ে আয় ?"

শান্তি মৃদু হাসিয়া বলিল, "বাঃ! চুল বাঁধা কাপড় কাচা হবে না ?"

শশিমুখী যেন একটু বিরক্তভাবে বলিলেন, "সে হবে অখন,— তোকে যা বল্‌ছি শোন না।"

শান্তি আর কোন কথা বলিল না,—সে নীরবে তাহার কাকীমার আদেশ প্রতিপালন করিবার জন্য বৈঠকখানারদিকে চলিয়া গেল।

বৈঠকখানা গৃহে ভোলানাথ দত্ত প্রায় একঘণ্টাকাল একাকী বসিয়া বসিয়া কন্যার যন্ত্রণা ও কষ্টের কথা কল্পনায় যতদূর মসিবর্ণ করিতে পারা যায়, ততদূর করিয়া মস্ত বিবেচকের মত সেইটাই কেবলি নাড়িয়া চাড়িয়া উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া ভাবিতেছিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দেহের ভিতর হইতে রাগের

'ঝাঁজ' খাঁটী সরিষার তৈলের মত যেন নাকে চোখে ক্রমেই তীব্র হইয়া উঠিতেছিল। সেই সময় শান্তি আসিয়া অবনত মস্তকে, রাজ্যের লজ্জা সর্ব্বাঙ্গে জড়াইয়া, অতি মৃদুস্বরে বলিল, "আসুন,—আপনাকে কাকীমা ভেতরে ডাক্ছেন।"

ভোলানাথ দত্তের চিন্তাটা কিছু তীব্র ছিল, কাজেই শান্তির স্বরে তিনি যেন একটু চমকিত হইয়া উঠিলেন,—অসংলগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বল্লে,—ভেতরে যাব?"

শান্তি মৃদুস্বরে আবার বলিল, "হাঁ,—আসুন।"

দত্ত মহাশয় বলিলেন, "চল।"

শান্তি অগ্রসর হইল, কিন্তু দত্ত মহাশয় তখনও উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার স্থূল দেহ নাড়ানাড়ি করিতে একটু স্বভাবতই সময়ের প্রয়োজন। তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন, "আরে দাঁড়াও; তাড়াতাড়ি করাটা আমি মোটেই পছন্দ করি না!"

শান্তি দাঁড়াইল। দত্ত মহাশয় বহুকষ্টে হস্তের উপর দেহের কতকটা ভার অর্পণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার স্থূল পদদ্বয় গিলিবার জন্য প্রকাণ্ড জুতা জোড়াটা যেন সর্ব্বদাই হাঁ করিয়া থাকিত। তিনি এক একটী করিয়া অতি সতর্কতার সহিত পা দুইটা তাহার ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিলেন,—তাহার পর অতি ধীরে ধীরে শান্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ অন্তঃপুরের দিকে অগ্রসর হইলেন।

পিতা যখন কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিলেন, তখন শশিমুখীর

চুল বাঁধা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল, কেবল সিন্দূর পরিতে বাঁকি। পিতাকে কক্ষের ভিতরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি সিন্দূরের কৌটাটা খুলিয়া চিরুণীর সাহায্যে সীতায় একটু সিন্দূর পরিয়া, শশিমুখী পিতার চরণ-ধূলি গ্রহণ করিলেন। দত্ত মহাশয়,—বার দুই, "থাক্ থাক্" বলিয়া, পালঙ্কের একধারে যাইয়া উপবিষ্ট হইলেন।

শান্তি দত্তমহাশয়কে তাহার কাকীমার গৃহে পৌছিয়া দিয়াই চলিয়া যাইতেছিল, শশিমুখী তাহাকে ডাকিলেন; বলিলেন, "শান্তি, বাবার জন্যে গোটাকতক পাণ নিয়ে আয় তো।"

শান্তি কোন উত্তর দিল না,—কাকীমার আদেশ প্রতিপালন করিতে চলিয়া গেল। ভোলানাথ দত্ত চাদরখানা স্কন্ধের উপর হইতে নামাইয়া পালঙ্কের এক পার্শ্বে রাখিয়া, জুতাটা খুলিয়া বেশ একটু জুত করিয়া বসিলেন। তাহার পর কন্যার দিকে চাহিয়া, মুখে যতদূর সম্ভব কাতরতা মাখাইয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "সমস্ত দিন এমনই খাটতে হয় যে একটু চুল বাঁধবারও অবসর হয় না? আমি জানি এই রকমই কিছু একটা ঘটবেই। তোমার গর্ভধারিণীর যেমন বুদ্ধি! আমি তো তোমার রাজার ঘরে সম্বন্ধ করেছিলেম। খেটে খেটে আমার সোণার পুতুলটা একেবারে শুকিয়ে গেছে। জামাই বাবাজীকে বলতে পারিস্‌নে?"

একটা প্রকাণ্ড নিঃশ্বাস ভোলানাথ দত্তের যেন বুকের ভিতর

হইতে বাহির হইয়া আসিল,—তিনি নীরব হইলেন। স্বামীর উপর শশিমুখীর যত কিছু মান অভিমান বুকের ভিতর জমা হইয়াছিল,—পিতার কথায় তাহারা যেন ফাঁক পাইয়া হাঁফ্ ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিল। শশিমুখী ম্লানভাবে বলিলেন, "হাঁ,—সে কিনা সেই মানুষ। কোন দিন কোন কথা শোনে? এই ভাইঝীর বিয়েতে বাবু ছ'হাজার টাকা খরচ কর্ত্তে বসেছেন। এত ক'রে বল্লুম তা একেবারে কাণেই নিলেন না। এরপর বুঝতে পার্বেন।"

ভোলানাথ দত্ত ঘাড় নাড়িয়া অতি গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন, 'হুঁ—বুঝেছি। বাবাজীকে বেশ ক'রে কড়া রকম দু'কথা বলতে হবে দেখছি। বাবাজীকে এ কথা স্পষ্টই ব'লে দিতে হবে যে, আমার মেয়ে তাঁর কাছে দাসী-বৃত্তি কর্ত্তে আসেনি। যত্নের জিনিষ,—যত্ন করে রাখতে পারে ভালো, নইলে আমার মেয়েকে আমি এখানে রাখতে একেবারেই প্রস্তুত নই।"

শশিমুখী কোন উত্তর দিলেন না,—মুখখানি ভার করিয়া অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভোলানাথ দত্ত একটু নীরব থাকিয়া অবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবাজী এখন গেলেন কোথায়?"

শশিমুখী পিতার প্রশ্নের উত্তরে অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, "বোধ হয় বিয়ের বাজার কর্ত্তে। এইমাত্র পাকা দেখার জন্যে এক রাশ জিনিষ কিনে এনেছেন,—আবার বোধ হয় তাই কর্ত্তেই বেরিয়েছেন। আমার জা'টি তো আর কম নন,—ওঁকে ভাল মানুষ পেয়ে একেবারে সর্ব্বস্বান্ত করবার চেষ্টায় আছেন।

অতি কর্কশ স্বরে ভোলানাথ দত্ত উত্তর দিলেন, ‘হুঁ,—এই যে সর্ব্বস্বান্ত করাচ্ছি। আমি যখন এসেছি তখন, এর একটা বিলি ব্যবস্থা না ক’রে আর উঠ্‌ছিনি। আমিও সোজা লোক নয়—আমার নাম ভোলানাথ দত্ত।”

কথাটা বলিয়া দত্ত মহাশয়ের মুখখানা গর্ব্বে যেন ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল। বুদ্ধিমান পিতার বুদ্ধিটা একটু চানকাইয়া দিবার জন্য শশিমুখীও একটা কি বলিতে যাইতেছিলেন,—কিন্তু অনুপমকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাঁহার মুখের কথা ঠোঁটেই রহিয়া গেল,—তিনি তাড়াতাড়ি ঘোমটাটা বিলক্ষণ রকম টানিয়া দিয়া এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইলেন। অনুপম গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়াই শ্বশুর মহাশয়কে একটা প্রণাম করিলেন; মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কখন এলেন,—অতুল টতুল সব ভালো আছে তো?”

ভোলানাথ দত্ত গম্ভীর ভাবে বলিলেন, “হুঁ! বাবাজী একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি,—বলি টাকা রোজগার কর্ত্তে যে কষ্ট, তাতো বোঝ?”

অনুপম অবনত মস্তকে ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন, “আজ্ঞে হাঁ।”

দত্ত মহাশয় তাঁহার বাম চক্ষুটী অর্দ্ধ মুদ্রিত করিয়া মাথাটা বার দুই দোলাইয়া বলিলেন, “তবে?”

এই তবের যে অর্থ কি তাহা বুঝিতে অনুপমের কিছুমাত্র বিলম্ব

হইল না। তিনি এই তবের যাহা উত্তর তাহাই প্রদান করিতে যাইতে ছিলেন কিন্তু কি ভাবিয়া নিজেকে আবার সংযত করিয়া ফেলিলেন। হেট মুণ্ডে ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে আপনার কথার ঠিক অর্থ বুঝতে পারলুম না।"

জামাতার কথায় ভোলানাথ দত্তের মুখে একটা বিশ্রী হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি তাহার রুক্ষ আওয়াজটাকে বেশ একটু মোলাম করিয়া বলিলেন, "বাবাজী তুমি ছেলে মানুষ,—তার ওপর অতি ভাল মানুষ—সংসারের গতি কিছুই বোঝ না। এই যে তোমার ভাইটি তোমায় পথে বসাবার চেষ্টায় আছেন তার কি কিছু বোঝ?"

অগ্নি স্পর্শ মাত্র বারুদ যেমন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, অনুপমের ভিতরটাও ঠিক সেই ভাবে জ্বলিয়া উঠিল। তিনি একবার তীক্ষ্ণ চক্ষে তাহার শ্বশুরের মুখের পানে চাহিয়া আবার মস্তক অবনত করিলেন। ভোলানাথ দত্তের স্থূল মস্তিষ্কে বোধ হয় সে চাউনির অর্থ প্রবেশ করিল না। তিনি জামাতাকে নীরব দেখিয়া আবার আরম্ভ করিলেন, "বাবাজী, এখনও বোঝ,—নইলে কি এর পর আমার মেয়েটির হাত ধরে পথে গিয়ে দাঁড়াবে। ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই এতো ধরা কথা; এর জন্যে কে কবে নিজের সর্ব্বনাশ করে বলতে পারো? বুদ্ধিমানের মত এখনও আমাদের কথাগুলো শোন,—এমন ক'রে আর নিজের সর্ব্বনাশ ডেকে এনো না।"

অনুপম আর সামলাইতে পারিলেন না,—বেশ একটু তীব্র কণ্ঠে বলিলেন "দেখুন আমার কাজ আমি যতটা বুঝি, অপরের ততটা বোঝা একেবারেই অসম্ভব। তা ছাড়া অপরের কার্য্যে অজাচিত ভাবে মতামত প্রকাশ করা একেবারেই ধৃষ্টতা মাত্র।"

জামাতার কথায় ভোলানাথ দত্ত একেবারে রীতিমত চটিয়া উঠিলেন। জামাতাকে বাধা দিয়া ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন, "আমার মেয়েত আর ভাতের কাঙ্গাল নয়, যে তোমার বাড়ীতে দাসী বৃত্তি কর্‌বে। আমার মেয়েটিকে আজই পাঠিয়ে দাও,—তার পর তোমার যে ভাবে ইচ্ছে উচ্ছন্নে যাও,—আমাদের আর বলবার দরকার কি?"

স্বরটা একটু তীব্র হওয়ায় অনুপম যেন লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিলেন,—কিন্তু শ্বশুর মহাশয়ের কথায় তাঁহার সে ভাবটা কাটিয়া গেল। তিনি বেশ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আপনার মেয়ে ভাতের কাঙ্গাল না হ'তে পারে, কিন্তু স্বামীর বাড়ীতে স্ত্রীলোকের দাসী-বৃত্তি করাও কম সৌভাগ্যের কথা নয়। সে যাক্,—আপনার মেয়েকে পাঠাবার আমি মালিক নই। আমার দাদাকে গিয়ে বলুন,—তিনি যদি নিয়ে যেতে বলেন, আপনি অনায়াসে নি'য়ে যেতে পারেন।"

লজ্জায় ঘৃণায় অনুপমের ভিতরটা যেন কম্পিত হইতেছিল,—তাঁহার আর এক মুহূর্ত্তও তথায় অপেক্ষা করিবার ইচ্ছা ছিল না।—

সে স্থান পরিত্যাগের জন্য তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই সময় ভোলানাথ দত্ত মুখ চোখ বেশ রাঙ্গা করিয়া বলিলেন. "আমিত আর তোমার দাদার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দিইনি,—দিয়েছি তোমার সঙ্গে, তখন আবার দাদা টাদার প্রয়োজন কি ?"

অনুপম অতি রুক্ষ স্বরে বলিলেন, "মেয়ের বিয়ে ছেলের সঙ্গে দিলেও,—মেয়েকে আনবার সময় ছেলের বাপ কিংবা তার যে কোন অভিভাবক থাকেন, তাঁকে বলা শুধু নিয়ম নয়,—ভদ্রতা।"

অনুপম আর তথায় এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করিলেন না,—অতি দ্রুতপদে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। জামাতার রুক্ষ স্বরে ভোলানাথ দত্ত একেবারে গুম্ খাইয়া গেলেন,—তাঁহার মুখের ভাবটা এমনি বিশ্রী হইয়াগেল যে, সুর্পনখার নাক কাণ কাটিবার পরও বোধ হয় মুখের ভাবটা তত বিশ্রী হয় নাই। ঘোমটার অন্তরালে শশিমুখীর অবস্থা যে কি হইল আর কি না হইল তাহা কেবল অন্তর্য্যামীই বলিতে পারেন।

অপূর্ব্ব আফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া জলযোগের পর সবেমাত্র বৈঠকখানায় বসিয়াছেন, ঠিক সেই সময় ভোলানাথ দত্ত সিপাহি বিদ্রোহের নানা সাহেবের মত একেবারে রুক্ষ মেজাজে বৈঠকখানার ভিতর প্রবেশ করিলেন। বিনা আড়ম্বরে একেবারেই বলিয়া বসিলেন, "আমি আমার মেয়েকে নিয়ে যেতে চাই।"

অপূর্ব্ব ভিতরের ব্যাপারটা একেবারেই অবগত ছিলেন না,—কাজেই ভোলানাথ দত্তের ভাবান্তর বিশেষ লক্ষ্য করিলেন না।

তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "সে তো বেশ কথা,—ছেলে মানুষ,—মাঝে মাঝে বাপের বাড়ী যাওয়া ভাল। তা শনিবার শান্তির পাকা দেখা,—তারপর যেদিন হয় একটা ভাল দিন দেখে নিয়ে যাবেন।"

কথাটা শুনিবামাত্র দত্ত মহাশয় বাহির হইতে যাইতেছিলেন, অপূর্ব্ব বিনীত ভাবে বলিলেন,—"তা একটু বস্‌বেন না?"

দত্ত মহাশয় কেবল মাত্র বলিলেন, "না,—অনেকক্ষণ এসেছি।"

তিনি যে ভাবে বৈঠকখানার ভিতর প্রবেশ করিয়াছিলেন আবার ঠিক সেই ভাবেই বাহির হইয়া গেলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

আনন্দময়ীর শত নিষেধ অনুরোধ সত্বেও ভোলানাথ বাবু সন্ধ্যার বহু পূর্ব্বেই কন্যার তদ্‌বিরে রওনা হওয়ায়,—আনন্দময়ীর মস্তকে যেন চিন্তার আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। স্বামীর বুদ্ধির উপর তাঁহার কোন দিনই আস্থা ছিল না। সেই স্বামী যখন কনিষ্ঠা কন্যার নিকট গিয়াছেন,—তখন নিশ্চয়ই একটা মহা অনর্থ ঘটিবেই। অগ্নি যদি বায়ুর সাহায্য পায় তাহা হইলে তাহার দাহিকা শক্তি যেমন শত মুখে বিস্তারিত হইয়া উঠে; সেইরূপ কন্যার উত্তেজনার সাহায্য পাইয়া তিনি যে নিশ্চয়ই জামাতাকে যাহা তাহা একটা বলিবেন তাহাতে সন্দেহ কিছুমাত্র নাই। জামাতা আদরের সামগ্রী,—যত্নের বস্তু! সে কি নিমিত্ত শ্বশুরের অসংযত বাণী সহ্য করিবে,—কাজেই কন্যার জীবনের সুখ-শান্তি চিরদিনের মত নষ্ট হইয়া যাইবে।

ভোলানাথ দত্তের গমনের পর প্রায় দুই তিন ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে,—রাত্রিও ক্রমেই গভীর হইতে আরম্ভ হইয়াছে তথাপি স্বামীকে ফিরিতে না দেখিয়া কন্যার জন্য আনন্দ-ময়ীর প্রাণ ক্রমেই আকুল হইয়া পড়িতেছিল। বাৎসল্য তাঁহার হৃদয় দ্বারে আঘাত ক'রিয়া সন্তানের অমঙ্গল আশঙ্কায় শত সহস্র

কুভাবনার সৃষ্টি করিতেছিল। স্বামীর উপর তাঁহার একটা রাগ ভিতর হইতে গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিয়া সমস্ত দেহটাকে একেবারে আনচান করিয়া তুলিয়াছিল। আনন্দময়ী বিনা কাজে কেবলি ছটফট্ করিয়া এ ঘর ও ঘর করিয়া বেড়াইতে ছিলেন। সেই সময় স্বামীর কণ্ঠস্বর নিম্নে পাইয়া তাঁহার ভাবনার বেগটা আর একবার হৃদয়ের কাণায় কাণায় উদ্বেলিত হইয়া যেন উছলিয়া উঠিল। তিনি খবরটা লইবার জন্য তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেলেন।

বেশ পরিবর্ত্তন করিবার জন্য ভোলানাথ দত্তও উপরে উঠিতে ছিলেন,—আনন্দময়ীর সহিত সিঁড়িতেই তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। পতিকে দেখিয়া পত্নী বিশেষ চিন্তিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ গা,—তুমি কি শশীর বাড়ী গিয়েছিলে? কেমন দেখে এলে—খবর সব ভালোতো?"

দত্ত মহাশয় দাঁড়াইলেন না,—সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতেই পত্নীর কথার উত্তর দিলেন, "গেছলেম বই কি,—সংবাদ একেবারেই ভাল নয়। তবে এইটুকু জেনে রাখ,—তোমার মেয়ে আজ থেকে বিধবা,—অমন জামায়ের বাঁচা চেয়ে মরাই ভালো!"

আনন্দময়ী তাড়াতাড়ি জিহ্বা কাটিয়া কর্ণে অঙ্গুলি দিলেন,—তাঁহার আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না,—তিনি নীরবে স্বামীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ উপরে উঠিতে লাগিলেন। দত্ত মহাশয় শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া উত্তরীয়খানা আল্‌নার উপর টাঙ্গাইয়া

রাখিয়া জামাটা খুলিয়া ফেলিলেন, তাহার পর মুখখানা ভার করিয়া শয্যার এক পার্শ্বে যাইয়া হেট মুণ্ডে উপবিষ্ট হইলেন। আনন্দময়ীও স্বামীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিলেন,—দত্ত-মহাশয়ের ভাব ভঙ্গি দেখিয়া কোন কথা কহিতে তাঁহার সাহস হইল না। তিনি নীরবে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া, কন্যা সম্বন্ধে কি হইল না হইল জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কাহারও মুখে কথা নাই, এই ভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর সহসা রুক্ষ স্বরে ভোলানাথ দত্ত চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "ওরে ব্যাটা মান্‌কে তামাক নিয়ে আয়।"

কিন্তু ভৃত্য মাণিকচন্দ্র উত্তর দিল না,—তাহার হইয়া উত্তর দিলেন আনন্দময়ী, "মাণিক বাজারে গেছে,—আমি ঝিকে বল্‌ছি, তামাক দিয়ে যেতে।"

পত্নীর কথায় রাগে ভোলানাথ দত্তের স্থূল দেহটা একেবারে কাঁপিয়া উঠিল,—তিনি কর্কশ কণ্ঠে বলিলেন, "যদি তোমাদের একটুও বুদ্ধি বিবেচনা থাক্‌তো—বাড়ী ফিরলেই আমার তামাকের যে দরকার সেটা বুঝি আর খেয়াল থাকে না।"

আনন্দময়ী মৃদু স্বরে বলিলেন,—"তুমি যে এখনি ফিরবে তা কেমন ক'রে জানবো বল। তা রাগ ক'চ্ছ কেন,—তোমার তামাক পেলেই তো হ'লো।"

দত্ত মহাশয় তাঁহার গোল চাকা পানা মুখখানা একেবারে বিশ্রী রকম বিকৃত করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "রাগ কচ্ছি

কেন ? তোমারই দোষে আজ একটা চ্যাংড়া ছোড়া, আমার জামাই হ'য়ে আমায় কিনা ভদ্রতা শিখ্‌তে বলে। আমার কাছে কত ব্যাটা ভদ্রতা শিখে নামজাদা ভদ্রলোক হয়ে গেল, আর জামায়ের কি না এত বড় আস্পর্দ্ধা ! তোমার বুদ্ধিতে একটা হাঘোরের ঘরে মেয়েটাকে দিয়েই আজ আমায় এই অপমানটা হ'তে হলো। নইলে সাধ্যি কি আমার মুখের উপর এত বড় কথাটা বলে।"

স্বামীর কথাগুলা শুনিয়া আনন্দময়ীর প্রাণটা যেন একেবারে হৃদয়ের ভিতর বসিয়া গেল ! স্বামী যে একটা কিছু গুরুতর কাণ্ড বাধাইয়া আসিয়াছেন তাহা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। এই পাঁচ ছয় বৎসর কন্যার বিবাহের পর কনিষ্ঠ জামাতা যে সামান্য টুকুও তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছে তাহাতেই আনন্দময়ী একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই দশ মুখে সকলের নিকটেই কনিষ্ঠ জামাতার সুখ্যাতি করিতেন। সেই শিষ্ট, শান্ত, সুধীর ছেলেটি যখন তাঁহার পূজ্যপাদ শ্বশুর মহাশয়কে ভদ্রতা শিক্ষা করিতে বলিয়াছে ; তখন ব্যাপারটা যে বেশ একটু স্থান জুড়িয়াই গড়াইয়াছে তাহাতে আর ভুল নাই ? আনন্দময়ী মহা ব্যস্ততার সহিত উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অনুপম তোমায় ভদ্রতা শিখ্‌তে বল্লে ! তার তো তেমন স্বভাব নয় ! তোমার যে মিষ্টি কথা, এমন কোন শক্ত কথা বলেছ, যাতে মানুষ কিছুতেই রাগ সামলাতে পারে না।"

ভোলানাথ দত্ত তাঁহার পত্নীর কথার মাঝখানেই বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "না, শক্ত কথা শোনাব কেন, তাকে পূজো করবো। সর্ব্বস্ব উড়িয়ে দিয়ে আমার মেয়েকে পথে বসাবার চেষ্টায় আছেন, ভাল কথা বল্‌তে গেলুম তা না তেরিয়া। ভোলানাথ দত্ত কারুর তেরিয়ার ধার ধারে না। শনিবারে তার গুষ্টির কি শ্রাদ্ধ হবে, সেটা শেষ হ'ক্, তারপর মেয়েকে নিয়ে এসে সমস্ত সম্পর্ক রহিত ক'রে দিচ্ছি: ভাববো মেয়ে আমার বিধবা হয়েছে।"

স্বামীর মুখে কন্যার অকল্যাণের কথা,—যাহা নারীর সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ অভিসম্পাত, তাহাই বার বার শ্রবণ করিয়া আনন্দময়ী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি বিরক্ত ভাবে অতি ক্রুদ্ধ স্বরে উত্তর দিলেন, "বালাই—ষাট্! বাপ হ'য়ে অমন কথা কি মুখে আনে! এত বয়স হ'লো, এখনও একটু মুখের আট ঘাট হ'লো না। শ্বশুরবাড়ীর সম্পর্ক তুলে দিয়ে বাপের বাড়ী এসে থাকবে! ছি ছি, এমন পোড়া কপাল শত্রুরও যেন না হয়। তুমি দেখছি নিজের মেয়ের সর্ব্বনাশ নিজে না করে আর ছাড়বে না!"

রাগে ধিক্কারে আনন্দময়ীর হৃৎপিণ্ডটা ফুলিয়া উঠিয়া যেন কণ্ঠনালি পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিল, তিনি আর কথা কহিতে পারিলেন না। একটা ভৎর্সনার দৃষ্টিতে স্বামীর পানে চাহিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন। ভোলানাথ দত্ত পত্নীর এরূপ মুখ চোখের ভাব,—এরূপ তীব্র রুষ্ট স্বর পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই,—শোনেনও নাই।

তিনি যেন একটু স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। গৃহ পালিত পোষা কুকুর যাহাকে মারিয়া ধরিয়া নানাভাবে ত্যক্ত করিলেও, যে কোন দিন কাহাকেও কামড়ায় না, সে যদি সহসা তাহার মনিবকে দংশন করিয়া বসে, তাহা হইলে রাগ ও বিস্ময় প্রাণের মধ্যে একই সঙ্গে উৎপত্তি হইয়া তাহাকে যেমন একেবারে হতবম্ব করিয়া দেয় ভোলানাথ দত্তের অবস্থাও কতকটা সেইরূপ হইল। তিনি সহসা কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। আনন্দময়ী আবার বলিলেন, "বৌমার বাবা এসে যা বল্‌বার নয় তাই যদি তোমার মুখের উপর বলেন, তা হলে তুমি কি তা সহ্য কর ?"

ভোলানাথ দত্তের বিস্ময়ের ভাবটা তখন অনেকটা কাটিয়া আসিয়াছিল, তিনি বিকৃত স্বরে বলিলেন, "আমি আর সেই একটা চ্যাংড়া ছোড়া—বুদ্ধিহীন মুখ্যু ! শ্বশুর বাড়ী—কিসের শ্বশুর বাড়ী! শ্বশুর বাড়ী ব'লে তো আর আমি মেয়েটাকে মেরে ফেল্‌তে পারিনি। দিন রাত খাটুনি, বুঝলে, এমন একটু ফুরসোৎ নেই যে চুলটা পর্য্যন্ত বাঁধে ?"

আনন্দময়ী বিরক্তভাবে বলিলেন, "নাও মিছে ব'কো না,—মোটেতো চা'রটী না পাঁচটী লোক, তার আবার খাটুনি কি! নিজের সংসারে খাটাইতো লক্ষ্মী। পটের বিবির মত পায়ের উপর পা দিয়ে বসে থাক্‌লে লক্ষ্মী পর্য্যন্ত বিরক্ত হয়ে সেই সংসার থেকে চলে যান।"

দত্তমহাশয় মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিলেন "লক্ষ্মী থাকলো আর গেল তাতে আমার কি। আমি চাই আমার মেয়েটি সুখে

থাক্। আমি যে এতগুলি টাকা খরচ করে মেয়েটীর বিয়ে দিছলেম কেন! দিন রাত খাটবার জন্যে।"

যে বুঝিবে না তাহাকে বোঝান মানুষেরতো দূরের কথা, ভগবানেরও অসাধ্য। স্বামী যে কি পদার্থ, সেই স্বামীর ঘর—সতীর-স্বর্গ, যে কত পবিত্র, আনন্দময়ী তাহা বুঝিতেন, তাই তিনি নির্ব্বোধ কন্যার জন্য কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। সর্ব্ব দেবতার দেবতা, নারীর ইহকাল পরকাল, নারায়ণের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, সতীর পতি যে কত বড় তাহা কেবল সতীই অনুভব করিতে পারেন। তাহা ধারণা বা অনুভবের শক্তি অপরের নাই। সতীর পতি পূজায় বিশ্ব রেণু রেণু হইয়া যায়,—অসম্ভব সম্ভব হয়, বিধাতার পবিত্র আশীর্ব্বাদ নিরন্তর বর্ষিত হইয়া জ্বালাময় সংসারে স্বর্গের পারিজাত ফুটাইয়া তোলে। চঞ্চলা অচলা হইয়া সমস্ত সংসারটী ধারণ করিয়া থাকেন। স্বামীর সহিত তর্ক করা স্ত্রীলোকের কতদূর অপরাধ আনন্দময়ীর নিকট তাহাও অজ্ঞাত ছিল না। তিনি জানিতেন বিনা বিচারে স্বামীর বাক্য আদেশের মত মাথায় পাতিয়া লওয়াই নারীর প্রধান কর্ত্তব্য। আজ কেবল কন্যার মঙ্গলের জন্যই, বাৎসল্যের উগ্র উত্তেজনায় তিনি সেই স্বামীর সহিতও তর্কে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন 'স্বামী কিছুতেই বুঝিবেন না, তখন তিনি একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন। কন্যার ভবিষ্যৎ জীবনের মসীময় চিত্র তাঁহার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠায়, তাঁহার চক্ষুদ্বয় ছল্ ছল্ করিয়া

উঠিল। পত্নীর মুখের ভাব দেখিয়া দত্ত মহাশয় মাথাটা নাড়িয়া বেশ একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ওসব আমরা ঢের বুঝি। যুক্তিতে এঁটে উঠতে না পারলেই মেয়েমানুষের শেষ সম্বল হ'চ্ছে চোখের জল—পুরুষকে জয় করবার প্রধান অস্ত্র। তা ব'লে কি আর ও সব আমাদের মত বুদ্ধিমান লোকের কাছে খাটে। লোকে একশো পাত্র দেখবার পর এক কাঁড়ি টাকা খরচ করে মেয়ের বিয়ে দেয় কেন! সুখে থাকবার জন্যই তো, নইলে আর পাত্রের ভাবনা কি? দুশো একশো টাকায় কি আর পাত্র মেলে না?"

একটা গাঢ় নিঃশ্বাস ফেলিয়া আনন্দময়ী মৃদু স্বরে বলিলেন, "সুখ দুঃখ ভগবানের হাত। দুঃখ যদি বরাতে থাকে, মানুষের সাধ্যি কি যে তাকে সুখী করে,—তা ব'লে কি আর মেয়ে মানুষের শ্বশুর বাড়ীর সম্পর্ক তুলে দেওয়া উচিত। যে মেয়ে মানুষ স্বামীর আদর থেকে বঞ্চিত, তার আবার পৃথিবীতে সুখ কি! আমরা তো এই জানি। তারপর তোমার যা ভালো বিবেচনা হয় তাই কর,—তুমি যখন বুঝবে না,—তখন তোমায় আর কি বলবো বল।"

ইতি মধ্যে মাণিক চাঁদ আসিয়া তামাক দিয়া গিয়াছিল। দত্ত মহাশয় গুড়গুড়ির নলটা তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "আমার যা ভালো বিবেচনা হবে আমি যে তা কর্ব্বো, সেটা আর বলতে হবে কেন। আমি কি তাই—যে মেয়ে মানুষের বুদ্ধিতে চ'লবো। যে জামাই হ'য়ে ভোলানাথ দত্তের মুখের উপর লম্বা লম্বা কথা

কয়, আমি আবার তার মুখ দেখবো,—তার সঙ্গে আবার কোন সম্পর্ক রাখবো!"

ভোলানাথ দত্ত মুখখানা গম্ভীর করিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন। স্বামীর কথায় একটা তীব্র অভিমান শক্তিশেলের মত আনন্দময়ীর হৃদয়ের ঠিক মাঝখানে আসিয়া বিঁধিল। তিনি অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া নীরবে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

আকাশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, মেঘের চিহ্ন মাত্র নাই,—সুনীল আকাশে সোনার চাঁদ, সোনা মাখিয়া সোনার হাসি হাসিয়া যেন ঢলিয়া পড়িতেছে। ধরণীর গায়ে হাসি ছড়াইয়া সে যেন আজ হাসির ভিতর দিয়া নাচিয়া নাচিয়া আকাশের গায়ে ভাসিয়া যাইতেছে। জ্যোছনা সুন্দরীর অপরূপ রূপের প্রভায়, রজনী-সতীর কৃষ্ণবসন একেবারে শুভ্র হইয়া গিয়াছে। ক্রোধের প্রচণ্ড দহনে অনুপমের দেহের সমস্ত রক্ত একেবারে মাথায় গিয়া জমিয়াছিল,—তাই তিনি মাথাটাতে একটু স্নিগ্ধ বাতাস লাগাইবার জন্য, গৃহে হইতে বাহির হইয়া বরাবর একেবারে ছাদে আসিয়া উঠিয়াছিলেন। শ্বশুর মহাশয়ের রুক্ষ বাক্যগুলা ঠিক যেন বিষাক্ত তীরের মত তাঁহার কর্ণের ভিতর বিষ ছড়াইয়া একেবারে হৃদয়ের মধ্যস্থলে গিয়া বিঁধিয়াছিল! উন্মুক্ত ছাদে চাঁদের আলোয়,—স্নিগ্ধ মধুর শীতল বাতাসেও তিনি তাঁহার ভিতরটা তখন পর্য্যন্ত ও শীতল করিতে পারেন নাই। বিষের তীব্র জ্বলুনি তাঁহার হৃৎপিণ্ডটাকে মুষড়াইয়া মুষড়াইয়া ধরিতেছিল। দত্ত মহাশয়ের স্পর্দ্ধাটা উত্তপ্ত লৌহ শলকার মত মাঝে মাঝে তাঁহার হৃদয়ের উপর ভাসিয়া উঠিয়া যেন থাকিয়া থাকিয়া খোঁচা মারিতেছিল। নির্ম্মল পূর্ণচাঁদের

দিকে চাহিয়া তিনি ছাদের উপর ধীরে ধীরে পাইচারি করিতে-ছিলেন, আর পত্নী ও পত্নীর পিতার কথাবার্ত্তা ও আচরণটা মনে মনে চিন্তা করিতেছিলেন।

ঐ মেঘশূন্য সুনীল আকাশে সুন্দর চাঁদ কত শুভ্র,—কত নির্ম্মল, কিন্তু তথাপি একটা কলঙ্কের কালি তাহার বুকের উপর ছাপ মারিয়া দিয়াছে। এত শুভ্র,—এত নির্ম্মল হইয়াও চাঁদ যে কেন কলঙ্কিত হইল,—এই জটিল সমস্যার কে উত্তর দিবে! নিজের স্বার্থ কেন যে মানুষ বুঝিতে পারে না,—কেন যে তাহারা স্বার্থ ভাবিয়া অন্ধ মরীচিকার পশ্চাৎ ধাবিত হয়—এ তত্ত্বের কে মীমাংসা করিবে! কে বলিবে কেন মানুষ সামান্য অর্থের জন্য,—প্রেম প্রীতি, বাৎসল্য ভালবাসা, স্নেহ ভক্তি, এমন কি ভদ্রতা পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়! পৃথিবীর সমস্ত অর্থ দিয়াও যাহা খরিদ করা যায় না, তাহাও সামান্য অর্থের জন্য বিসর্জ্জন দিতে তাহারা বিন্দুমাত্রও ইতস্ততঃ করে না! এ মায়া,—না মরীচিকা? অনুপমের মনের ভিতর এই কথাগুলাই বার বার উদয় হইতেছিল, আর পত্নী ও শ্বশুরের নিবুদ্ধিতার জন্য দুঃখে তাঁহার সমস্ত হৃদয়টা ভরিয়া যাইতেছিল।

ভ্রাতৃস্নেহ যাহা পিতার পবিত্র রক্তে প্রাণে প্রাণে বাঁধা; যাহা বিশ্বের প্রলয়েও ছিন্ন হইবার নয়, তাহাও কেমন করিয়া নারীর প্ররোচনায়,—ধরণীর পবিত্র সম্বন্ধ,—পত্নীর উত্তেজনায় চিরদিনের মত ছিন্ন হইয়া কত সোনার সংসার লণ্ড ভণ্ড হইয়া যায়, তাহাও যেন অনুপম চক্ষের উপর দেখিতে পাইতেছিলেন;

আর আতঙ্কে অনুশোচনায় তাঁহার প্রাণের ভিতরটা থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। বিষ যেমন যাহারই সহিত মিশুক, তাহাই একেবারে বিষাক্ত করিয়া ফেলে, সেইরূপ বিষাক্ত নারীর সংস্পর্শে পড়িয়া পুরুষ যে বিষাক্ত হইয়া উঠিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? লক্ষ্মী স্বরূপিনী কন্যারূপে যাহার জন্ম,—প্রীতিময়ী ভগ্নিরূপে যাহার বৃদ্ধি,—শান্তিময়ী পত্নীরূপে যাহার বিকাশ,—স্নেহময়ী জননীরূপে যাহার বিদায়, তাহারও এমন অদ্ভুত অধঃপতন কেমন করিয়া হয়! এই সকল অপ্রিয় চিন্তা বিজিত সেনার ন্যায় অনুপমের হৃদয় দ্বারে বার বার আসিয়া আঘাত করিতে লাগিল; এইগুলাকে হৃদয় হইতে বিদায় করিবার জন্য তিনি একেবারে চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। কিন্তু বিদায় করিব বলিলেই চিন্তা বিদায় হয় কই! আজ যেন তাহারা তাঁহার পদতল হইতে ব্রহ্মতালু পর্য্যন্ত জড়াইয়া ধরিয়াছিল। একাকী ছাদে আর এমন ভাবে পাইচারী করিতেও তাঁহার ভালো লাগিল না, নীচে নামিবার জন্য ফিরিতে যাইতেছিলেন, সেই সময় পশ্চাৎ হইতে শান্তি ডাকিল, "কাকাবাবু।"

অনুপম ফিরিলেন। তাঁহার পুত্র কন্যা নাই,—তাঁহাদের ক্ষুদ্র সংসারটি আলো করিয়া কেবল এই একটী মাত্র ফুল স্নেহ-বৃক্ষে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার হৃদয়ে সঞ্চিত সমস্ত স্নেহ, এই মেয়েটীর সর্ব্বাঙ্গ জড়াইয়া প্রাণের ভিতর স্নেহ-সমুদ্রের সৃষ্টি করিয়াছিল। শান্তির সরল মুখের মধুর হাসি, মুহূর্ত্তে তাঁহার সমস্ত রাগ জল

করিয়া দিল। তিনি মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে শান্তি?"

শান্তি মৃদু হাসিল,—চাঁদের হাসি তাহার হাসির সহিত মিশিয়া যাওয়ায় যেন সেই ছাদের উপর স্বর্গ নামিয়া আসিল; সে হাসিতে হাসিতে বলিল, "কাকাবাবু, মা তোমায় ডাকছে,—তুমি একলা ছাদে কি কচ্ছ?"

অনুপম সে কথার কোন উত্তর দিলেন না,—তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর কাকীমার বাবা চলে গেছেন?"

শান্তি ঘাড়টা বাঁকাইয়া মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল, "হাঁ,—সেতো কখন! তুমি কাকীমার বাবাকে কি বলে এসেছ,—তাই কাকীমা কত কাঁদছে!"

আবার পত্নীর কথাটা উত্থিত হওয়ায় একটা ধিক্কার যেন সাঁড়াসীর মত অনুপমের হৃৎপিণ্ডটা চাপিয়া ধরিল। চাঁদের এমন শুভ্র আলোও তাহার চক্ষের সম্মুখে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল, তিনি গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাই বুঝি তোর মা আমায় ডাক্‌ছে?"

শান্তি মুখখানি একটু মলিন করিয়া বলিল, "হুঁ! আমি মাকে গিয়ে বল্লুম, মা বল্লে তোর কাকাবাবুকে ডেকে নিয়ে আয়। হাঁ কাকাবাবু তুমি অত কাকীমাকে বক কেন?"

অনুপম কোন উত্তর দিলেন না,—শান্তির কথায় কেবলমাত্র

একটু মৃদু হাসিলেন। শান্তি আবার বলিল, "না কাকাবাবু তুমি আর অমন ক'রে কাকীমাকে বকতে পাবে না।"

শান্তির সরল কথাগুলিতে অনুপমের সমস্ত হৃদয়টা একেবারে স্নেহরসে গলিয়া গেল, তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা তাই হবে,—এখন চ'দিকি, শুনি তোর মা কেন ডাকছে!"

"মা আজ তোমায় খুব বকবে," বলিয়া শান্তি অগ্রসর হইল। অনুপম তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নীচে নামিয়া গেলেন।

বাহিরের জোড়া তক্তপোষের ফরাসের উপর একটা আলোর সম্মুখে বসিয়া অপূর্ব্ব একখানা মাসিক পত্র পাঠ করিতেছিলেন। গৃহের চৌকাঠের বাহিরে বসিয়া সরোজবাসিনী স্বামীর মুখপানে চাহিয়াছিলেন। সহসা তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁগা,—ছোটবৌয়ের বাবা এসেছিলেন, তিনি কি তোমায় কিছু বল্লেন?"

অপূর্ব্ব পুস্তক হইতে মাথাটা না তুলিয়াই বলিলেন, "হুঁ।"

সরোজবাসিনী বলিলেন, "হুঁ কি! ঠাকুরপো তাঁকে নাকি কি যা তা বলেছে,—তাই ছোটবৌ কাঁদছে। সে কথা তোমার সঙ্গে কিছু হ'লো!"

অপূর্ব্ব এবার ঘাড় তুলিলেন,—পত্নীর মুখের দিকে যেন একটু অবাক দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "কই না?"

সরোজবাসিনী যেন একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়িলেন, বলিলেন,

"কই না কিগো! তবে যে হুঁ বল্লে,—তোমার সঙ্গে তবে কি কথা হলো?"

অপূর্ব্বের সহিত দত্ত মহাশয়ের যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহাই বোধ হয় তিনি পত্নীকে বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু অনুপমকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি আবার পুস্তকে মনোনিবেশ করিলেন। সরোজবাসিনী মুখখানা একটু ভার করিয়া বলিলেন, "ঠাকুরপো তোমার এ কি রকম আক্কেল! কুটুম্ব—তায়ে গুরুজন, শ্বশুর, বাড়ীতে এসেছেন কোথায় যত্ন খাতির কর্ব্বে তা না যা তা অপমান করে বসেছ। দেখ দিকি ছোটবৌ, কত কাঁদছে! তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি যে কবে হবে তাতো বুঝতে পারিনে।"

ছাদের উন্মুক্ত বাতাসে,—শান্তির সহিত কথাবার্ত্তায় অনুপমের রাগটা অনেকটা পড়িয়া আসিয়াছিল, কিন্তু বৌদিদির কথায় তাহা যেন আবার নূতন করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তিনি বিরক্ত ভাবে বলিলেন, "খবরদার বৌদি, তুমি আমার শ্বশুর বাড়ী সম্বন্ধে কিংবা আমার স্ত্রীর সম্বন্ধে কোন কথা বলো না। তুমি যদি আর সে বিষয়ে কোন কথা কও, তাহ'লে এবার সত্যিই তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে যাবে। এমন একটা শক্ত দিব্যি দেব, যে আর কোন দিন কখনও মুখ তুলে কথা কইতে পারবে না।"

অনুপমের কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সরোজবাসিনী বেশ একটু বিদ্রূপ জড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "তা না হ'লে পুরুষ কি।

লেখাপড়া শিখে মানুষ যে এমন গোঁয়ার হয়, তাতো কখন দেখিনি। গুরুজন যদি কিছু অন্যায়ই বলে থাকেন, চুপ করে থাক্‌লেই পারতে, তোমার জবাব দেবার কি দরকার ছিল বল্‌তে পারো ?"

ছয় বৎসর কাল পত্নীর বিকট আচরণে অনুপম একেবারে তিতি-বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার বিচার বিবেচনার আর অবসর বা ইচ্ছা কিছুই ছিল না। তিনি স্বরটা একটু বেশ চড়াইয়া বৌদির কথার উত্তর দিলেন, "আমি তো আর গণ্ডার নই, যে তীর, বর্ষা, গুলি কিছুই বিঁধ্‌বে না। আমি মানুষ, কাজেই সহ্যের বাহিরে গেলেই জবাব দিতে হয়।"

সহসা সরোজবাসিনীর স্বরটা একেবারে মিহি হইয়া গেল; তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "তা যা হবার তাতো হয়েছে। ছোটবৌ কাঁদছে,—যাও একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করে এস।"

এইমাত্র শ্বশুর মহাশয়ের সহিত অনুপমের যে কয়টা কথা হইয়াছিল তাহাতেই তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন পত্নীর সহিত তাহার পিতার কি কথাবার্ত্তা হইতে ছিল। নীচমনা স্বার্থপর পত্নীর আর মুখ দেখিবেন না, তাহা তিনি আজ একেবারে স্থির করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এ অবস্থায় বৌদিদির এই কথাগুলা যেন তাঁহাকে একেবারে বিদ্রুপ করিয়া উঠিল। কথাটার মাঝখানেই তিনি একেবারে পরিষ্কার জবাব দিলেন,—"আমি তো আর তার চখের জল মোছাবার মাহিনে করা চাকর নই! স্পষ্ট কথা শোন বৌদি, আমি অমন স্ত্রীর আর মুখ দেখ্‌তেও নারাজ! এ বিষয়ে যদি

তুমি কোন রকম কথা কও, তা'হলে তোমার ভাল হবে না, তা কিন্তু বলে দিলুম।"

সরোজবাসিনী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "স্ত্রীর চোখের জল মোছাবার, স্বামী মাহিনে করা চাকর না হতে পারে, কিন্তু বিনা মাহিনের যে চাকর, তাতো আর অস্বীকার করার জোটি নেই। বিয়ের রাত্রে শালগ্রামের সম্মুখে প্রত্যেক পুরুষকে যে সে কথা স্বীকার কর্ত্তে হয়। এখন গায়ের জোরে না বল্লে চলবে কেন ঠাকুরপো!"

অনুপম তাঁহার বৌদির কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "চলুক আর না চলুক, আমি যা পারবো না তা তোমায় স্পষ্ট বলে দিলুম। আমি তোমার সঙ্গে তর্ক কর্ত্তে চাইনি বৌদি, স্ত্রী যদি স্ত্রীর মতন না হয়, তাকে ত্যাগ করলেও পাপ হয় না।"

সরোজবাসিনী কথাটায় জোর দিয়া বলিলেন, "চলতেই হবে! সংসারে থাক্‌তে গেলে ইচ্ছেয় হক্ অনিচ্ছেয় হক্ অনেক কাজ কর্ত্তে হয়। চল্‌বে না বল্লেই তো আর হবে না।"

"না হয় তার আর কচ্ছি কি বল বৌদি," এই কয়টী কথা অতি মৃদুস্বরে বলিয়া অনুপম উঠিতে যাইতেছিলেন,—সরোজবাসিনী দেবরকে আঁটীয়া উঠিতে না পারিয়া স্বামীর দিকে মুখ ফিরাইয়া অতি বিরক্তভাবে বলিলেন, "ওগো শুন্‌ছো, তোমার ভায়ের আক্কেল,—ওনি নিজের স্ত্রীকে একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত কর্ত্তে পারবেন না।"

"ওগো" শুনিবা মাত্রই অপূর্ব্ব পুস্তকে মনটা আরও বেশ একটু অধিক পরিমাণেই সংযোগ করিয়াছিলেন, তিনি কোন উত্তর দিলেন না। স্বামীকে নীরব থাকিতে দেখিয়া সরোজবাসিনী স্বরটা একটু চড়াইয়া বেশ একটু ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "আমার কথা গুলো বুঝি আর কাণে গেল না। বই পড়া বন্ধ ক'রে ভাইটাকে একটু বুঝিয়ে বলতে পারছ না।"

অপূর্ব্ব একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ঘাড়টা তুলিলেন, তিনি পুস্তক খাঁনা বন্ধ করিয়া শান্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "চ'রে শান্তি উপরে যাই।"

একাদশ পরিচ্ছেদ

অনন্ত কাল হইতে অনন্ত দিন অনন্তের সহিত মিশিতে ছুটিয়াছে। বিশ্বের সুখ, দুঃখ,, আলো অন্ধকারের প্রতি তাহার ভ্রুক্ষেপ নাই। সে নিজের মনে নিজের কাজ সারিয়া চলিয়াছে; এই অশান্তি গোলযোগের ভিতর দিয়া যথাসময়ে শান্তির পাকা দেখার দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। নিকট আত্মীয় স্বজনে বসুদিগের বাটী বহুদিন পরে আজ আবার পরিপূর্ণ হইয়া জম জম করিয়া উঠিল। দুইটী ভায়ের একটী মাত্র কন্যা,—বসুদিগের সমস্ত সংসারের সমস্ত স্নেহ এই মেয়েটীকে বেষ্টন করিয়া সঞ্জিবীত হইয়া উঠিয়াছিল। কাজেই যতদূর সম্ভব আয়োজনের ত্রুটী হয় নাই। অশান্তিরূপিনী পত্নীর অশিষ্ট আচরণ দিন দিন উগ্র হইয়া যখন অনুপমের অসীম ভালবাসাটা স্থানচ্যুত হইয়া শূন্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে ছিল, তখন শান্তি ধীরে ধীরে বাড়িয়া কাকাবাবুর সবখানি স্নেহ একেবারে দখল করিয়া বসিয়াছিল। তিনি যে উৎসাহে, —যে আনন্দে শান্তির বিয়েতে অবত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, আজ যদি তাঁহার পত্নী সেই আনন্দের একটুখানিও ভাগ লইত, তাহা হইলে তাঁহার আর আনন্দ রাখিবার স্থান থাকিত না। কিন্তু বিশ্বনিয়ন্তা বুঝি সংসারে পরিপূর্ণ আনন্দের কাহাকেও অধি-

কারী হইতে দেন না, তাই এত আনন্দেও অনুপমের মনে সুখ ছিল না। যদি তিনি পত্নীকে বিদায় করিতে পারিতেন,—যদি তাহার সহিত সমস্ত সম্পর্ক রহিত করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে বোধ হয় তিনি সুখী হইতে পারিতেন। এই আনন্দের দিনে, এই মঙ্গল অনুষ্ঠানে বাড়ীতে থাকিয়া পত্নী যে চক্ষের উপর মুখখানা ভার করিয়া থাকিবে, তাহা অনুপমের একেবারেই অসহ্য। কিন্তু সহ্য করিতেই হইবে,—বিদায় করিবারও উপায় নাই। সে পথটা বৌদিদি একেবারে প্রস্তর প্রাচীরের মত বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছেন; মুখে যতই আস্ফালন করুন, অনুপমের সে শক্তি নাই যে বৌদিকে নড়াইয়া সে পথ মুক্ত করিতে পারেন, এক একবার ইচ্ছাটা বলবতী হইয়া পথটা মুক্ত করিবার জন্য দেহের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিতে চেষ্টা করিতে ছিল বটে, কিন্তু সর্প যেমন বেদের মন্ত্রপূত শিকড়ের সম্মুখে মস্তক অবনত করে; সেইরূপ তাঁহার সমস্ত শক্তিটা যেন শক্তিহীন হইয়া বৌদিদির সম্মুখে মাথা তুলিয়াই ফাটিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। ভাবটা এমনিই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছিল যে তিনি তাঁহার মনের ইচ্ছাটা পর্য্যন্ত ব্যক্ত করিতে পারিতেছিলেন না। অথচ পত্নীর মুখ চখের ভাব,—কথাবার্ত্তার ভঙ্গি যেন এই এক-বাড়ী লোকের সম্মুখে তাহাকে একেবারে খেলো করিয়া দিতেছিল।

শশিমুখী মুখখানা ভার করিয়া ঘরের ভিতর গোঁজ হইয়া বসিয়াছিলেন,—কথাবার্ত্তা বড় একটা কাহারও সহিত কহিতেছিলেন

না। নেহাত যাহা না কহিলে নয়, তাহাই কেবল, "হুঁ, হাঁ না" দিয়া সারিতেছিলেন। ব্যয়ের পরিমাণটা মনে মনে হিসাব করিয়া হৃদয়ে যেন এক সঙ্গে শত সহস্র বৃশ্চিক দংশন করিতে ছিল,—তাহার তীব্র জ্বালা যে চখে-মুখে ফুটিয়া পড়িবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?

আত্মীয় ললনাদিগের মধ্যে অনেক পাকা গিন্নিও আসিয়াছিলেন। তাঁহারা অনেক দেখিয়াছেন,—অনেক ঘা খাইয়াছেন। কেবল মেয়ে মানুষের মুখ দেখিয়াই অনেক কথাই বলিয়া দিতে পারেন। তাঁহারা দু'একটা খোঁচা মারিয়াই শশিমুখীর মনের ভাবটা বুঝিয়া লইয়াছিলেন। সরোজবাসিনীর পিসতুত ননদ অন্নপূর্ণা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ বৌ,—ছোটবৌ যে অমন মুখখানি চুণ করে ঘরের ভেতর চুপটী করে বসে আছে? কোন কাজ কর্ম্মে হাত দিচ্ছে না কেন গা? অসুখ বিসুখ করেছে নাকি?"

সরোজবাসিনী কয়েক জন আত্মীয় ললনার সহিত নীচে ভাঁড়ার ঘরে বসিয়া ফলের রেকাবী সাজাইতেছিলেন। অন্নপূর্ণার কথায় তিনি মুখ তুলিয়া চাহিলেন,—মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ঠাকুরঝি, ছোটবৌ এ সব বড় একটা পারে না। একে ছেলে মানুষ, তায়ে বড়লোকের মেয়ে। কোন কাজ কর্ম্ম তো কখন হাতে নাতে কর্ত্তে হয় নি!"

অন্নপূর্ণা নাকটা বার দুই টানিয়া একটু বিকৃত স্বরে বলিলেন,

"তা হক্ ভাই বড়লোকের মেয়ে,—তা'বলে কি কাজের বাড়ীতে এমন চুপ করে বসে থাকা ভালো। পানগুলোও ত সাজতে পারে ?"

ছোটবৌয়ের কথাটা সহসা উত্থিত হওয়ায় সরোজবাসিনী যেন একটু মুস্কিলে পড়িলেন। এইরূপ যে একটা কিছু কথা উঠ্‌বে তাহা তিনি পূর্ব্বেই জানিতেন,—পাছে কথাটা বিস্তৃত হইয়া চারিদিকে কালি ছিটাইয়া পড়ে,—সেই আশঙ্কায় তিনি কথাটা চাপা দিবার জন্য হাসিতে হাসিতে আবার বলিলেন, "আচ্ছা দেখ-দেকি ঠাকুরঝি,—ফলের রেকাবীতে যা দেওয়া হয়েছে তাই থাক্‌বে,—না আর কিছু বেশী দিতে হবে।"

অন্নপূর্ণা আজ বার বৎসর বিধবা হইয়াছেন,—সধবা এবং বিধবা দুই অবস্থাই সংসার করিয়া তিনি একেবারে সংসারের ঘুণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। সরোজবাসিনী যে ছাই দিয়া মাছ ঢাকা দিতেছেন, তাহা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। তিনি সরোজ-বাসিনীর কথাটায় যেন কাণ না দিয়াই বলিলেন, "তা তুমি যাই বল বৌ, বৌ ঝিকে কি এমন করে বসিয়ে রাখ্‌তে আছে! এর পর স্বভাবটী যে একেবারে মাটী হয়ে যাবে।"

গৃহস্থের সংসারে বৌ ঝি বিনা কাজে যদি দিনরাত বসিয়া থাকে তাহা হইলে তাহার স্বভাব যে খারাপ হইয়া যায়, একথাটা সরোজবাসিনীর নিকট মোটেই নূতন নহে। নিজের সংসারের জন্য খাটাই যে স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম্ম, তাহা তিনি বিলক্ষণ রকম জানিতেন। কিন্তু শুধু তিনি জানিলে কি হইবে, যাহার জানা

দরকার সে যে তাঁহার কোন কথাই গ্রাহের ভিতর আনে না। আত্মীয় কুটুম্ব ললনাদিগের নিকট এ কথা তো আর প্রকাশ করা যায় না! নিজের সংসারের কুৎসা নিজে আর কেমন করিয়া প্রচার করেন! কাজেই তাঁহাকে চুপ করিয়া থাকিতে হইল। সরোজ-বাসিনীকে নীরব দেখিয়া অন্নপূর্ণা আবার আরম্ভ করিলেন, "তা সত্যি কথা বলতে কি বৌ, তোমাদের ছোটবৌয়ের স্বভাবটী তত ভাল নয়। অহঙ্কারে যেন ফুলে আছেন—মেয়ে মানুষের অত অহঙ্কার কি ভাল ?"

ঘুরাইয়া ফিরাইয়া অন্নপূর্ণা কথাটা পাকাইবার চেষ্টায় ছিলেন,—কিন্তু সরোজবাসিনী তাঁহাকে আর অগ্রসর হইতে দিলেন না। তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "ঠাকুরঝি বোস,—আমি ততক্ষণ একবার দেখে আসি, শান্তির চুল বাঁধা শেষ হ'লো নাকি। এক্ষণি হয় তো আবার বাহিরে থেকে তাড়া আস্‌বে।"

সরোজবাসিনী গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। অন্নপূর্ণা কথাটা শেষ করিয়া শরীরটা হাল্কা করিতে না পারিয়া যেন একটু মনক্ষুণ্ণ হইলেন। বার দুই নাকটা সিটকাইয়া নীরবে এক পার্শ্বে ফলের রেকাবী সাজাইতে কি কি দোষ হইতেছে তাহাই খুজিয়া খুজিয়া বাহির করিতে লাগিলেন। কথাটা প্রাণ পাইয়াও যেন হাওয়ার অভাবে আর নড়িয়া চড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিল না।

দেখিতে দেখিতে সূর্য্য অস্তের সঙ্গে সঙ্গে দিনের আলো ফুরাইয়া গেল। ধীরে ধীরে আসিয়া সন্ধ্যারাণী নিজ রাজ্য বিস্তার করিয়া

বসিলেন। এখানে সেখানে দূরে দূরে, নক্ষত্রবালাগণ আকাশের গায়ে মতির মালা গাঁথিবার জন্য একে একে আসিয়া দেখা দিতে আরম্ভ করিলেন। বিশ্ব প্রকৃতির এই নূতন পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাকা দেখার সময়টাও নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। যথা সময়ে বামীর সহিত বরকর্ত্তা, পুরোহিত ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গগণ আসিয়া পাত্রীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। আজ বামীর বাহারটা কিছু জাঁকিয়া উঠিয়াছে। বাহার করিয়া আজ আবার নাকের উপর একটা ক্ষুদ্র রসকলি অঙ্কিত হইয়াছে! সে তাহার সঙ্গীগণকে বৈঠকখানা গৃহে বসাইয়া একবার তত্ত্বাবধানের জন্য বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল। উঠান হইতেই তাহার আগমন সংবাদটা সমস্ত বাড়ীময় বেশ একটু উঁচু গলায় প্রচার করিয়া দিল, "বলি দিদিমণি, কই গো,—মেয়ে সাজানো শেষ হ'লো। এদিকে যে বরের বাড়ীর সব এসে পড়েছেন।"

সরোজবাসিনী রান্নাঘরের ভিতর বসিয়া পাকা দেখার সহস্র প্রকার রন্ধন দ্রব্য বাটীর পর বাটীতে সজ্জিত করিতেছিলেন,—ঘটকঠাকরুণের সাড়া স্বর পাইয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিলেন। অঞ্চলে মুখের ঘামটা মুছিয়া বলিলেন, "যাও না ঘটকঠাকরুণ একবার ওপরে ছোট বৌয়ের ঘরে,—দেখে এস শান্তির সাজান শেষ হয়েছে কি না!"

বামী মৃদু হাসিয়া বলিল, "ছোট ঠাকরুণ শান্তিকে সাজাচ্ছেন নাকি। তবু ভাল যে রাগটা পড়ে গেছে! সেদিন যে ঝঙ্কার

দিয়ে উঠেছিলেন, সত্যি দিদিমণি, আমারতো ভয়ই হয়ে গেছলো।"

পাচক আসিয়া বলিল, "মা ঠাকরুণ, কালিয়াটা কিসে ঢালবো ?"

সরোজবাসিনী ফিরিলেন, বলিলেন, "তুমি যাও, আমি যাচ্ছি।"

তাহার পর ঘটকঠাকরুণের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ছেলে মানুষ, তার উপর একটু মাথা গরম আছে, তাই ওরকম ছোটবৌ মাঝেমাঝে ফস্ করে রেগে যায়।"

সরোজবাসিনীর দাঁড়াইয়া দুটো কথা বলিবারও অবসর ছিল না। ঠিকে বাউন রাঁধিতেছে,—তাহাদের প্রতি পদে পদে বলিয়া দেওয়া প্রয়োজন। তিনি আর দাঁড়াইতে পারিলেন না,—ঘটক-ঠাকরুণকে উপরে পাঠাইয়া দিয়া আবার তাড়াতাড়ি রন্ধন গৃহে প্রবেশ করিলেন।

তিনি সবে আসিয়া রান্না ঘরে ঢুকিয়াছেন, সেই সময় অন্নপূর্ণা আসিয়া চৌকাটের বার হইতে বলিলেন, "হাঁ বৌ, ওকি রকম মেয়ে সাজানো হয়েছে! আজকাল ভদ্রলোকের বাড়ীতে কি আর কেউ বোম্বাই শাড়ী পরে। পাঁচজন বাহিরের লোক এসেছে,—বল্‌বে কি ? ছোট বৌয়ের অত সব ভালো ভালো কাপড় রয়েচে,—আজকের দিনে তাও কি একখানা পরিয়ে দিতে নেই।"

সরোজবাসিনী রন্ধন লইয়াই ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন। সমস্ত দিনের মধ্যে একবারও উপরে যাইবার ফুরসোৎ পর্য্যন্ত

পান নাই। শান্তি কি কাপড় পরিয়াছে ,আর কি কাপড় পরে নাই তাঁহার তিনি কিছুই অবগত ছিলেন না। ছোটবৌয়ের উপর সে ভারটা দিয়া একরূপ নিশ্চিন্তই ছিলেন। এতক্ষণে অন্নপূর্ণার কথায় তিনি বুঝিলেন কেন শান্তির অঙ্গে বোম্বাই শাড়ী উঠিয়াছে। একখানা ভাল কাপড় আজকের দিনে একবার শান্তিকে পরিতে দিতেও ছোটবৌ নারাজ! দুঃখে ঘৃণায় সরোজ-বাসিনীর অশ্রুজলে নয়ন-পল্লব সিক্ত হইল। ধূমাচ্ছন্ন রন্ধন গৃহের মৃদু আলোকে অন্নপূর্ণা তাহা লক্ষ্য করিতে পারিলেন না, তিনি আবার বলিলেন, "এখন রান্নাঘর থেকে একবার বেরিয়ে,—যাও কাপড়টা বদ্‌লে দাওগে। মেয়ে দেখতে এলে বাড়ীতে সবচেয়ে ভাল কাপড় যেখানা থাকে, সেইখানাই পরিয়ে দেয় জানি,—তোমাদের সব উল্‌টো শ্রী।"

সরোজবাসিনী মুখ তুলিয়া ঠাকুরঝির পানে চাহিলেন; অতি গাঢ় স্বরে বলিলেন, "ওই হবে এখন ঠাকুরঝি,—কাপড় একখানা যা হয় হ'লেই হলো।"

অন্নপূর্ণা অতি বিরক্তভাবে বলিলেন, "অমনি যা হয় হ'লেই হ'লো। যা হয় হ'লে যদি হ'তো তা হ'লে, আর লোকে নিজেদের না থাকলেও পরের চেয়ে এনে পরাত না।"

ঠাকুরঝির কথার উত্তরে সরোজবাসিনী নিজেকে একটু সংযত করিয়া লইয়া কি বলিতে যাইতেছিলেন কিন্তু দেবরকে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া নীরব হইলেন, অনুপম বৌদিদির নিকট

উপস্থিত হইয়া অতি ব্যস্তভাবে বলিলেন, "কই বৌদি, কি হ'লো! দাও শান্তিকে পাঠিয়ে,—আশীর্ব্বাদের সময় যে হয়ে এল।"

অনুপমের কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ঝুন ঝুন করিয়া মলের শব্দ হইল, তিনি তাড়াতাড়ি ফিরিলেন। বামী ঘটকির সহিত শান্তি জননীকে প্রণাম করিতে আসিয়াছিল, সে সম্মুখে কাকাবাবুকে দেখিয়া ঘাড়টী অবনত করিয়া প্রথমে তাঁহাকেই প্রণাম করিল। অনুপম শান্তির পরণে বোম্বাই শাড়ী দেখিয়া একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন ;—স্বরটা সপ্তমে তুলিয়া বলিলেন, "বৌদি, তোমার আক্কেল গুলো সব গেল কোথায়! এ হয়েছে কি? বোম্বাই শাড়ী একখানা কি বলে পরিয়ে দিয়েছ! আজকাল কি এ কেউ পারে? ভদ্রলোকের সুমুখে এই পরিয়ে কখন মেয়ে বার করা যায়! বলি ছোট গিন্নির কাপড় গুলো কি সব চিতেয় দিতে হবে!"

দেবরের স্বর পাইয়া সরোজবাসিনী রান্না ঘরের দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। আর বুঝি কথাটা চাপা থাকে না, দেবরের যখন দৃষ্টিতে আসিয়াছে, তখন তাহা যে এখনি সমস্ত বাড়ীময় প্রচারিত হইয়া পড়িবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই ; তথাপি তিনি এ শুভদিনে একবাড়ী লোকের সম্মুখে একটা কেলেঙ্কারীটা অধিক দূর না গড়ায় তাই তাড়াতাড়ি বলিলেন, "তাতে আর হয়েছে কি ঠাকুরপো,—লোকে তো আর কাপড় দেখ্‌বেনা— দেখবে মেয়ে।"

অনুপম তাঁহার বৌদিদির কথায় কোন উত্তর দিলেন না,—

তিনি শান্তির দিকে ফিরিয়া বলিলেন "দাঁড়া শান্তি আমি আস্‌ছি।"

সরোজবাসিনীর বোধ হয় আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অনুপম আর এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইলেন না। শশিমুখী যে ইচ্ছা করিয়া এই কাপড়খানা পরাইয়া দিয়াছে ইহা তাঁহার একেবারের জন্যও মনে হয় নাই। মানুষ যে এত নীচ হইতে পারে তাহা তাঁহার ধারনাই ছিল না। তথাপি তাঁহার পত্নীর উপর রাগে সর্ব্ব শরীর জ্বলিয়া উঠিয়া ছিল। তিনি একেবারে তিন লম্ফে উপরে চলিয়া গেলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

যে অগ্নি এতদিন ধরিয়া অনুপমের হৃদয়ের ভিতরে ধূমায়িত হইতেছিল,—আজ তাহা বাতাস পাইয়া দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠায় তাঁহার চৈতন্য পর্য্যন্ত লোপ হইয়া গেল। তিনি উপরে তাঁহার শয়ন কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিয়া অতি তীব্র স্বরে কহিলেন, "শান্তিকে ও কাপড়খানা পরিয়ে দিয়েছে কে?"

শশিমুখী কক্ষের ভিতর বসিয়া কয়েকজন সমবয়সী ললনার সহিত ফিস্ ফিস্ করিয়া, বোধ হয় নিজের পোড়া অদৃষ্টের ব্যাখ্যাই করিতেছিলেন,—মুখ তুলিয়া স্বামীর মেঘাচ্ছন্ন মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন। অনুপমকে সহসা কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া,—অন্যান্য ললনাগণ মেষপালে ব্যাঘ্র পড়িবার মত একবারে জড়সড় হইয়া এক হস্ত পরিমাণ ঘোমটা দিয়া তাড়াতাড়ি কোন ক্রমে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। শশিমুখী স্বামীর মুখ চোখের ভাব দেখিয়া ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন,—মৃদু স্বরে বলিলেন, "কেন—কি হয়েছে?"

অনুপম একটা তীব্র কটাক্ষে পত্নীর মুখ চোখ ঝলসাইয়া দিয়া বলিলেন, "সেটা তত দরকারী কথা নয়, দরকারি হচ্ছে, আমি শুন্‌তে চাই তাকে ও কাপড়খানা পরিয়ে দিয়েছে কে?"

স্বামীর রুক্ষ আওয়াজটা আজ যেন শশিমুখীর অন্য রকম: ঠেকিল। তিনি স্বামীর নিকট হইতে অনেক তিরস্কার ভর্ৎসনা খাইয়াছেন, কিন্তু এমন শুষ্ক নিরস কণ্ঠস্বর আর কখনও শোনেন নাই। তিনি সহসা কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না, নির্বাক হইয়া রহিলেন। অনুপম একটু নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন, "তুমি যে এমনি করে দশজনের সম্মুখে প্রতিদিন আমার মাথা হেট করে দেবে, তা আর আমি কিছুতেই সহ্য করবো না।"

আশে পাশে উপস্থিত আত্মীয় ললনাগণ আড়ালে দাঁড়াইয়া সমস্তই শুনিতেছিল,—কাজেই শশিমুখীর আর সহ্য হইল না, রাগের ধমকে ফস্ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি করবে! ফাঁসী দেবে নাকি!"

বহ্নিতে আহুতি পড়িলে তাহার শিখা যেমন লক লক করিয়া উঠে, অনুপমও ঠিক সেই ভাবে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, "সেই তোমার উপযুক্ত শাস্তি! এ কথা মনে থাকা উচিত যে ভালবাসতে জানে, সে ত্যাগ করতেও পারে।"

ত্যাগের কথাটায় অভিমান আসিয়া এমনি তীব্র ভাবে শশিমুখীর হৃদয়ে আঘাত করিল যে তিনি জ্ঞান হারাইলেন, স্বামীর মুখের উপরই চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"ত্যাগ করবে তা অত ভয় দেখাচ্ছ কি! ত্যাগ করলে তো বাঁচি। একখানা ভালো কাপড় পর্ত্তে দিইনি, এইতো আমার অপরাধ; নিজে একখানা দিয়ে যদি চোখ রাঙ্গাতে তাহলে সাজতো। একখানা গেলে তো আর হবে না।"

পত্নীর এই তেজের কথাগুলা অনুপম একেবারে নির্ব্বাক হইয়া শুনিতে ছিলেন। প্রবল দুর্যোগের পূর্ব্বে বিশ্ব-প্রকৃতি যেমন স্তব্ধ হইয়া যায় তিনিও সেইরূপ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। আর একটীও কথা না বলিয়া আবার ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেলেন।

অনুপমের উপরে উঠিবার ভাব দেখিয়াই সরোজবাসিনী ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন; এক্ষণে দেবরকে বিশুষ্ক মুখে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া তাঁহার প্রাণের ভিতরটা যেন হাহাকার করিয়া উঠিল। তিনি ছল ছল নেত্রে দেবরের মুখের পানে চাহিলেন। অনুপম অতি ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, "বৌদি ও কাপড়খানা ছাড়িয়ে দিয়ে যা হয় একখানা সাদা কাপড় পরিয়ে দাও। আগে জান্‌লে আমি শান্তির জন্যে একখানা ভালো কাপড় কিনে আন্‌তুম।"

কত দুঃখে যে এই কথা কয়টী দেবরের মুখ হইতে বাহির হইয়া আসিল, তাহা সরোজবাসিনী প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন;—এবং বুঝিলেন বলিয়াই তিনি আর কথা কহিতে পারিলেন না। বড় মুখ করিয়া দেবর উপরে উঠিয়া ছিলেন, কিন্তু পত্নীর কাছে অপমানিত হইয়া হতাশ ভাবে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এ ব্যথা পুরুষের যে কত ভয়ঙ্কর, তাহা পুরুষ পৌরুষত্বের জোরে চাপিয়া রাখিতে পারে বলিয়াই জানিতে পারা যায় না। প্রকাশ হইলে সেই ব্যথায় সমস্ত বিশ্ব জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইত। স্ত্রীর নিষ্ঠুর আচরণে দেবরের হৃদয়টা যে একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে

তাহা যেন তিনি চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইলেন। অতি গভীর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া, নির্জ্জীবের মত সেইখানেই কাট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। আজ সহসা তাঁহার প্রথম মনে হইল, সব মিথ্যা,—সমস্তই ফাঁকি! এই ঘর দ্বার, আলো বাতাস, প্রেম স্নেহ, সমস্তই তাঁহার এক নিমিষে মরুভূমির মরীচিকার মত একেবারে উবিয়া গেল। এই পাকা দেখার উৎসব আয়োজন, খাওয়ান দাওয়ান সমস্তই যেন তাঁহার একেবারে মিথ্যা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এই বিরাট উৎসবের পণ্ডশ্রম, পাষাণের মত তাঁহার বুকের উপরে একেবারে চাপিয়া বসিল। অনুপম কথাটা বলিয়াই বাহির হইয়া যাইতেছিলেন কিন্তু অন্নপূর্ণা কথা পাড়িলেন, বলিলেন, "তাও কি কখন হয়, শুভ কর্ম্মে কি কখন সাদা পর্ত্তে আছে। যাদের খাবার সংস্থান নেই তারাও এ দিনে একখানা ছোবান কাপড় পরিয়ে দেয়। কেন,—কি হ'লো, ছোট বৌ কাপড় দিলে না?"

শশিমুখী যাহা বলিয়াছিলেন তাহা স্বামীর প্রকাশ করা অসম্ভব। অনুপম কেবল একটী ক্ষুদ্র "না" বলিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। সরোজবাসিনী অন্নপূর্ণার কথার উত্তর দিলেন, "দেবে না কেন! ঠাকুরপো বোধ হয় কি ঝগড়া ঝাটি করেছে, তাই তার রাগ হয়ে গেছে।"

অন্নপূর্ণা নাকটা একবার টানিয়া বলিলেন, "আমরা তো বাপু নামজাদা দজ্জাল মেয়েমানুষ। কিন্তু এমন ছোট নজর তো কখন দেখিনি বাবা। স্বামীর মুখের ওপর কথাটি পর্য্যন্ত

কইতে আমাদের কোন দিন সাহসটি পর্য্যন্ত হয় নি। কোথা থেকে এমন হাঘোরের মেয়ে ঘরে আন্‌লে বলতো বৌ?"

গোলমালটা পাকিয়া উঠিয়া, বুঝি পাকা দেখাটা কাঁচাইয়া দেয়! বামী আর থাকিতে পারিল না, সে তাড়াতাড়ি বলিল, "এখন তা নিয়ে তর্ক কল্লে কি হবে বাছা,—এ দিকে যে আশীর্ব্বাদের সময়টা বয়ে যায়। যা করবার একটু শিগ্‌গির ক'রে ফেল।"

দুই একজন করিয়া আত্মীয়ললনাগণ গোলমাল শুনিয়া একে একে আসিয়া উঠানের মাঝখানে জড় হইতে আরম্ভ হইয়াছিলেন। কথাটা যখন একবার বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তখন আর এই একবাড়ী স্ত্রীলোকের মাঝে চাপা দেওয়া অসম্ভব। ভগবান প্রদত্ত স্ত্রীলোকের স্বভাব, কথা পড়লে ফোড়ন দিতেই হইবে। এমন কথাটা-কি ফোড়োন না দিয়া তাহারা থাকিতে পারে? কাজেই চারিদিক হইতে ফোড়োন পড়িয়া কথাটার ধোঁয়ায় সমস্ত উঠান অন্ধকার হইবার মত হইল। সরোজবাসিনী লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিলেন, তিনি আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, একেবারে ঝড়ের মত শশিমুখীর ঘরে ঢুকিয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিয়া উঠিলেন," বলি ছোটবৌ, তোমার জন্য কি কুটুম কুটুম্বিতেও বন্ধ কর্ত্তে হবে। এক বাড়ী লোকের সম্মুখে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া কর্ত্তে একটু ঘেন্নাও হয় না। ঘেন্নায় আমার যে লোকের সম্মুখে মুখ দেখাতে ইচ্ছা হচ্ছে না।"

শশিমুখী তখন তোরঙ্গ হইতে রং বেরংএর রেশমের, সল্‌মার কাপড় টানিয়া টানিয়া বাহির করিয়া মেজের উপর ফেলিতে-

ছিলেন। তাঁহার গৌবরণ মুখ রাগে একবারে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। জায়ের কথা কর্ণে প্রবেশ করায় তিনি দরজার দিকে ফিরিয়া ফুলিতে ফুলিতে বলিলেন, "বন্ধ করবার দরকার কি দিদি, আজ বাদে কালতো আমি বিদেয় হচ্ছি,—তারপর তুমি তোমার আত্মীয় কুটুম্ব নিয়ে মনের সুখে ঘর কর।"

সরোজবাসিনী একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "তা আমি জানি। যাতে দশজনের কাছে মুখ দেখাতে পারবো না, তাকি আর তুমি না করে ছাড়বে। চিরকালটা এই বৌ নিয়ে আমার হাড় মাস জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল।"

শশিমুখী সে কথার কোন জবাব দিলেন না, গোঁ ভরে বলিলেন "এই সব কাপড় বের করে দিয়েছি,—যা যা দরকার নিয়ে যাও। অদৃষ্টের ভোগ ভুগতেই হবে, কালতো আর থাক্‌ছিনে।"

"যাবে, তা এত ভয় দেখাচ্ছ কি ছোটবৌ! গেলে তুমিও বাঁচ, আমারও হাড় জুড়োয়," বলিয়া সরোজবাসিনী বাহির হইয়া যাইতেছিলেন,—বামী আসিয়া সংবাদ দিল, "বলি দিদিমণি এখানে কচ্ছ কি? ওদিকে বাবু যে তোমায় ডাকাডাকি কচ্ছেন।"

সরোজবাসিনী ঘটকঠাকুরুণের কথার কোন উত্তর না দিয়া তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেলেন। বামীও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিম্নে নামিতে ছিল, কিন্তু গৃহের ভিতর দৃষ্টি পড়ায় সে থমকাইয়া দাঁড়াইল। ছোটবৌকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, এই যে ছোট্‌ঠাকরুণ,

—কাপড় বের করেছ। আর সময় নেই,—দাও দেকি একখান, শান্তিকে পরিয়ে দিইগে।"

একবার বঙ্কিমভাবে ঘটক্‌ঠাকুরুণের দিকে একটা কটাক্ষপাত করিয়া শশিমুখী মৃদুস্বরে বলিলেন, "আমি কি দেব বল ঘটক-ঠাকুরুণ;—আমার কি আর পছন্দ আছে! আমি দিলে তো আর বড়গিন্নির পছন্দ হবে না।"

তখন আর ছোট গিন্নির সহিত কথা কাটাকাটির সময় ছিল না। "তোমার পছন্দের কাছে কি আর কারুর পছন্দ আছে ছোটঠাকুরুণ, তা কি আমি জানি না।" বলিতে বলিতে তখন বামী গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া ছিল; বলিল, "এই বাসন্তী রংয়ের কাপড়খানা হ'লেই হবে।"

শশিমুখীর দিবার অপেক্ষা না রাখিয়াই বামী সেই কাপড়-খানা তুলিয়া লইল, এবং শশিমুখীকে কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়াই সে তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেল।

শান্তিকে আনিবার জন্য অনুপম অন্তঃপুরের ভিতর প্রবেশ করিবার পর প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া গেল, তথাপি তাঁহার দেখা নাই;—এদিকে শুভ সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসায় বর ও কন্যা উভয় পক্ষের পুরোহিতদ্বয়ই কন্যাকে আনিবার জন্য তাগাদার পর তাগাদা জুড়িয়া দিলেন। কাজেই বাধ্য হইয়া অপূর্ব্বকে উঠিতে হইল। এত দেরী হইবার কারণটা কি জানিবার জন্য তিনি একটু ব্যস্ত হইয়া অন্তঃপুরের ভিতর প্রবেশ করিলেন।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া উঠানেই তাঁহার সহিত অন্নপূর্ণার সাক্ষাৎ হইল। অপূর্ব্বকে সম্মুখে দেখিয়া অন্নপূর্ণা বেশ একটু যেন ব্যতি-ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "হাঁ অপূর্ব্বদা, যখন ছোটবৌয়ের আচরণ তোমরা সকলেই জান,—তখন কোন্ আমায় একটু লিখে দিলে! আমি একটু খবর পেলেই তো আমাদের বৌয়েদের একখানা ভাল কাপড় নিয়ে আসতে পারতুম। তাহ'লে তো আর এখন এমন দশজন ভদ্রলোকের সম্মুখে অপ্রস্তুত হতে হ'তো না।"

অপূর্ব্ব মৃদু হাসিলেন, বেশ একটু কৌতুহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন কি হয়েছে! শুধু শুধু অপ্রস্তুত হবার হঠাৎ আবার কি কারণ হ'লো?"

অন্নপূর্ণা নাকটা বার দুই টানিয়া তাড়াতাড়ি যেন একটা কি ভয়ানক কাণ্ড ঘটিয়াছে এইভাবে বলিলেন, "অপ্রস্তুত নয়! এত ভালো ভালো কাপড় থাক্‌তে ছোটবৌ আজকের দিনে কিনা শান্তিকে একখানা বোম্বাই শাড়ী পরিয়ে দিয়েছে।"

অপূর্ব্ব এতক্ষণে অনুপমের বিলম্বের হেতুটা কতকটা যেন বুঝিতে পারিলেন। তিনি আবার একটু মৃদু হাসিয়া কি বলিতে যাইতে-ছিলেন কিন্তু পত্নীকে আসিতে দেখিয়া নীরব হইলেন। তিনি পত্নীর মুখে চোখে যে ছায়াটা লক্ষ্য করিলেন তাহাতেই বেশ বুঝিলেন, সরোজবাসিনীর বুকের ভিতর তখন একটা প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত হইতেছে। সরোজবাসিনীকে দেখিয়া অন্নপূর্ণা আবার বলিলেন, "কি হ'লো বৌ,—কাপড় একখানা আন্‌তে পারলে?"

সরোজবাসিনীকে উত্তর দিবার অবসর না দিয়াই অপূর্ব্ব গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ছেলে মানুষ, সমস্ত দিন ধরে কষ্ট ক'রে সাজিয়ে দিলে, তাতেও তোমাদের পছন্দ হ'লো না! অমনি একটা গোলমাল বাধিয়েছ! একটা যা হয় খুঁত না ধরে বুঝি আর থাকৃতে পারো না। যেমন তুমি,—আর তেমনি অনুপম। সে এখন গেল কোথায় ?"

সরোজবাসিনী লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিলেন,—কণ্ঠ হইতে তাঁহার আর স্বর বাহির হইতে চাহিতেছিল না,—তিনি যেন জোর করিয়া বলিলেন, "ঠাকুরপো তো অনেকক্ষণ বাহিরে গেছে।"

অপূর্ব্ব বিরক্তভাবে বলিলেন, "কই না,—এদিকে বাইরে পুরুত মশাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন,—ওদিকে যে সময় হয়ে গেছে,— দেখ আবার—সে এ সময় কোথায় গেল! তোমরা দুজনেই একেবারে সমান পাগল। যাও এখন শান্তিকে নিয়ে এস,—তোমাদের পাগলামীর জ্বালায় আশীর্ব্বাদের সময়টাতো আর দাঁড়িয়ে থাকৃবে না।"

শান্তি নিকটেই রান্নাঘরের দরজার সম্মুখে হেটমুণ্ডে দাঁড়াইয়া ছিল,—এই গোলোযোগে তাহার সুন্দর মুখখানি একেবারে কালো হইয়া গিয়াছিল। তাহাকে লইয়াই এই ঝটিকা উঠিয়াছে, লজ্জার একটা ঘুরনি বাতাস ঘুরিয়া ঘুরিয়া যেন তাহার সমস্ত হৃদয়টি মুচড়াইয়া ধরিতেছিল। জননীর আহ্বানে তাহার পরিপূর্ণ কিশোরের ক্ষীণ তনুটী যেন একবার দুলিয়া উঠিল,—সে

ধীরে ধীরে রন্ধন গৃহ হইতে বাহির হইয়া, পিতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। শান্তির দিকে ফিরিয়া অপূর্ব্ব কহিলেন, "বা এই তো বেশ সাজানো হয়েছে। এও তোমাদের পছন্দ হচ্ছিলো না?—চ'রে শান্তি।"

কন্যাকে লইয়া অপূর্ব্ব বাহিরে যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন,—কিন্তু বামী আসিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "এই যে কাপড় এনেছি ও কাপড়খানা বদ্‌লে দিলে হয় না?"

বামীকে দেখিয়া অপূর্ব্ব আবার দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি ঘটক-ঠাকুরুণের কথার উত্তরে বেশ একটু উচ্চৈস্বরে যেন সকলকে শুনাইয়া বলিলেন, "ছোটবৌমা, নিজের পছন্দ মতন যে কাপড় যত্ন করে পরিয়ে দিয়েছেন,—তার চেয়ে আর ভালো কাপড় কিছু হতে পারে না। আমি বেঁচে থাকতে সেখানা বদ্‌লে দিয়ে তাঁকে অপমান করবার অধিকার কারুর নেই।"

অপূর্ব্বের কণ্ঠ হইতে এই কথাগুলা এমনি একটা অপূর্ব্ব স্নেহরসে সিঞ্চিত হইয়া সুস্পষ্ট বাহির হইয়া আসিল যে উপস্থিত সকলেই তাহা বেশ পরিষ্কার ভাবেই শুনিতে পাইলেন। এ কথার আর জবাব নাই,—কাজেই বামীকে চুপ করিয়া যাইতে হইল। কেবল অন্নপূর্ণা একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া একবার নাকটা একটু সিট্‌কাইলেন। অপূর্ব্ব আর দাঁড়াইলেন না,—কন্যাকে লইয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

পত্নীর নিকট অপমানিত হইয়া অনুপম লজ্জায় ধিক্কারে উৎ-

পীড়িত মস্তকে কাহাকেও কিছু না বলিয়া, শান্তির জন্য একখানা ভালো কাপড় কিনিয়া আনিতে ছুটিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার সে পরিশ্রম স্বার্থক হইল না। দুঃখে ক্ষোভে তিনি যখন একরাশ টাকা দিয়া কাপড়খানি লইয়া ফিরিলেন তখন শান্তির আশীর্ব্বাদ শেষ হইয়া গিয়াছে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

শান্তির আশীর্ব্বাদের পর তিন চারি দিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আজও শশিমুখীর পিত্রালয়ে যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই। আশীর্ব্বাদের পর দিনই ভোলানাথ দত্ত কন্যাকে লইয়া যাইবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু সে দিনটা নাকি যাত্রার পক্ষে একেবারেই অশুভ ছিল, তাই সরোজবাসিনী ঘোরতর আপত্তি করায় শশিমুখীর আর যাওয়া হয় নাই। দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছিল কিন্তু সরোজবাসিনীর পঞ্জিকায় যাত্রার মত ভাল দিন একটাও মিলিতে ছিল না,—তাই টাল্ বেটালে এ কয়টা দিন কোন ক্রমে কাটিয়াছে। কিন্তু কাল আর কাটিবার উপায় নাই,—কাল যাত্রার মহা প্রশস্ত দিন। ভোলানাথ দত্ত নামকরা পণ্ডিত দ্বারা পঞ্জিকা দেখাইয়া যথা সময়ে তাহা জানাইয়া পাঠাইয়াছেন। কাল প্রত্যুষেই ছোটবৌ পিত্রালয়ে গমন করিবেন।

সংবাদটা পাইয়া পর্য্যন্ত সরোজবাসিনীর মনটা একেবারেই খারাপ হইয়া গিয়াছিল,—সংসারের কাজকর্ম্মে আজ যেন তাঁহার আর কিছুতেই মন বসিতেছিল না। কত সাধ করিয়া দেবরের বিবাহ দিয়া তিনি এই তের বৎসরের মেয়েটীকে গৃহে আনিয়াছিলেন, কত আশা ছিল,—দেবরকে সুখী করিবেন, ছোটবৌ

তাঁহার সংসারের দোসর হইবে, কিন্তু সে আশাটা সমূলে বিনষ্ট হইতে বসায় তিনি চক্ষে অন্ধকার দেখিতেছিলেন। নারীর বহু জন্মের তপস্যার ফল স্বামীর ভালবাসা যে কি বস্তু,—এই পাঁচ ছয় বৎসরেও সেটা তিনি ছোটবৌকে বুঝাইয়া উঠিতে পারিলেন না। এ দুঃখ যে তাঁহার রাখিবার স্থান নাই। না বুঝিয়া শশিমুখী নিজের দোষে, অবহেলায় যে জিনিষ হারাইতে বসিয়াছে, তাহা যে অমূল্য, এ কথাটা তাঁহাকে কেমন করিয়া বুঝাইয়া দিবেন। প্রিয়জনের সর্ব্বনাশ যদি অনিচ্ছা সত্ত্বেও চক্ষের সম্মুখে দেখিতে হয়, তাহা হইলে মানুষের অবস্থা যেরূপ হয়, আজ সরোজবাসিনীর অবস্থাটাও কতকটা সেইরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

পাকা দেখার রাত্র হইতে অনুপম আর বাড়ীর ভিতর শুইতে আসিতেন না। রাত্রে বাহিরের বৈঠকখানায় শুইয়া থাকিতেন। সেই হইতে তিনি আর পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করেন নাই। সরোজবাসিনী এ কথাটা জানিতে পারিয়া দেবরকে বাটীর ভিতর শোয়াইবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছিলেন, কিন্তু উত্তরে অনুপম কেবলমাত্র বিষাদসুরে বলিয়াছিলেন, "তার চেয়ে বলনা বৌদি আমি বাড়ী থেকে চলে যাই।"

দেবরের মুখ চোখের দিকে চাহিয়া ও কণ্ঠস্বর শুনিয়া আর দ্বিতীয়বার অনুরোধ করিতে সরোজবাসিনীর সাহস হয় নাই। তিনি ছোটবৌকে মিনতিপূর্ণ স্বরে অনেক বুঝাইয়া অনুপমকে বাড়ীর ভিতর ডাকিয়া আনিবার জন্য নানা ভাবে সাধ্য

সাধনা করিয়াছেন; কিন্তু তেজবান আরবী ঘোড়ার মত ছোটবৌ সেই যে ঘাড় বাঁকাইয়া বসিয়াছেন, সে ঘাড় আর তাঁহার কিছুতেই সোজা হয় নাই।

সংসারের কাজ কর্ম্ম সারিয়া অনেক রাত্রে সরোজবাসিনী শয়ন গৃহে প্রবেশ করিলেন। অপূর্ব্ব বিছানার একধারে শুইয়া একখানা দৈনিক সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন,—পদ-শব্দ পাইয়া তিনি একবার মাত্র দরজার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিয়া, আবার সংবাদ পত্রে মনোনিবেশ করিলেন। সরোজবাসিনী স্বামীর মস্তকের নিকট আসিয়া বেশ গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ গা, কাল কি ছোট'বৌ বাপেরবাড়ী যাবে?"

অপূর্ব্ব কাগজখানা পড়িতে পড়িতেই উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ,—ভোলানাথ বাবু পাঁজি দেখিয়েছেন, কাল বেলা ন'টা অবধি খুব ভাল দিন।"

সরোজবাসিনী পালঙ্কের উপর উঠিয়া অপূর্ব্বের মাথার নিকট আসিয়া বসিয়াছিলেন,—তিনি স্বামীর মস্তকের কেশগুলি ধীরে ধীরে নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "শুধু ভাল দিন হ'লেইতো আর হয় না,—শান্তির বিয়ের আগে কি আর ছোটবৌয়ের যাওয়া হয়?"

অপূর্ব্ব সংবাদ পত্রখানা একপার্শ্বে রাখিয়া বলিলেন, "কেন হ'বে না! শান্তির বিয়ের তো এখনও প'নর যোল দিন দেরী, ছেলে মানুষের যখন ইচ্ছে হয়েছে,—তখন দু'চার দিন ঘুরে আসা ভাল।"

সরোজবাসিনী রুষ্টস্বরে বলিলেন, "তা আর ভাল নয়,—

দেখ্‌ছ একেই ঠাকুরপো ভেতরে পর্য্যন্ত শোয় না,—এখন কি ছোট বৌয়ের যাওয়া উচিত।"

অপূর্ব্ব পাশ ফিরিয়া শুইতে শুইতে বলিলেন, "খুব উচিত। তাহ'লে তোমাদের পাগ্‌লামোটা একটু ঠাণ্ডা হয়। তা ছাড়া আমি ভোলানাথবাবুকে কথা দিয়ে ফেলেছি,—কাল তিনি নিতে আসবেন,—এখন কি আর না বলা যায়?"

স্বামীর কথায় সরোজবাসিনী সত্যই এবার ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন,—তিনি বেশ একটু ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, "তুমি তো কথা দিয়ে ফেলেছ, কিন্তু এত বড় সংসারটা আমি কি করে একলা চালাই বল দেকি! একি একলার কাজ, না বাপু, আমি তা পারবো না। কাল ছোটবৌয়ের যাওয়া হতেই পারে না।"

পত্নীর কথার ভাবটা যে অপূর্ব্ব না বুঝিলেন এমন নয়,—তিনি মনে মনে মৃদু হাসিয়া অতি শান্ত স্বরে বলিলেন, "যাও এখন আর বিরক্ত ক'রো না,—একটু সুস্থ হ'য়ে ঘুমোয় দিকি।"

তাহার পর একটা হাই তুলিয়া তিনি পাশ বালিস লইয়া বেশ জুত করিয়া শুইয়া বলিলেন, "আমি তো আর তোমাদের মতন পাগল নই।"

স্বামীকে জুত করিয়া শুইতে দেখিয়া সরোজবাসিনী আর কোন কথা কহিলেন না। সমস্ত দিন আফিসের পরিশ্রমের পর রাত্রে একটু সুনিদ্রা না হইলে অসুখ হইবার সম্ভাবনা,—এ অবস্থায় আর বিরক্ত করিতে তাঁহার সাহস হইল না। ছোটবৌয়ের

চিন্তায় অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহার নিদ্রা আসিল না। গৃহের আলো নিবাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, তিনি ছোটবৌয়ের গমন রহিত করিবার জন্য সেই অন্ধকারের ভিতর চোক বুজিয়া পড়িয়া পড়িয়া নানাবিধ যুক্তি আঁটিতে লাগিলেন, কিন্তু যুক্তিগুলা আজ একেবারে বিদ্রোহ হইয়া উঠিয়াছিল,—তাহারা যেন আর কিছুতেই বাগ মানিতে চাহিতে ছিল না। বহু রাত্রি পর্য্যন্ত নানা চিন্তা করিয়াও কোন একটা যুক্তি স্থির করিয়া উঠিতে না পারায় শেষ তিনি একেবারে হতাশ হইয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

প্রত্যহ যেমন প্রত্যূষে উঠিয়া সংসারের কাজে লিপ্ত হইতেন, আজও সেইরূপ সরোজবাসিনী সংসারের কার্য্যে লিপ্ত হইয়া পড়িলেন বটে, কিন্তু প্রাণে আর সে সুখ,—সে আনন্দ আসিল না। তবে সংসারের কাজ না করিলে নয়, কাজেই বাধ্য হইয়া তাঁহাকে কাজগুলি সারিয়া যাইতে হইতেছিল। ইহার মধ্যে ভোলানাথ দত্তের দাসী ও দরওয়ান কখন শশিমুখীকে লইয়া যাইবার জন্য একেবারে গাড়ী লইয়া উপস্থিত হইয়াছে তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। সহসা সাজিয়া গুজিয়া পিত্রালয় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া শশিমুখীকে সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইতে দেখিয়া তিনি একেবারে বিচলিত হইয়া পড়িলেন। বাহিরে গাড়ী আসিয়া বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; শশিমুখীর আর বিলম্ব করিবার সময় ছিল না। বহুদিনের প্রথা কোথাও গমনের সময় গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া যাইতে হয়,—কিন্তু তাহা আজও শশিমুখী একেবারে বিস্মৃত হইতে

পারেন নাই,—কাজেই মহা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে বড় জা'য়ের নিকট আসিতে হইয়াছিল। তিনি রন্ধন গৃহের চৌকাটের বাহির হইতেই বলিলেন, "দিদি, আমি চল্লুম। একবার রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এস।"

ছোট বৌয়ের সাড়া পাইয়া সরোজবাসিনী মুখ তুলিয়া চাহিলেন; অতি ধীর ভাবে বলিলেন "ছোটবৌ শোন, বড় জা'য়ের কথাটা রাখ, এখন বাপের বাড়ী যেও না। ঠাকুরপো রেগে আছে, এ সময়ে কি তোমার বাপের বাড়ী যাওয়া ভালো!"

ছোটবৌ কোন উত্তর দিলেন না,—কেবল মাত্র একবার মুখ খানা বিকৃত করিলেন। সরোজবাসিনী একটুখানি নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন, "আর যদি নেহাতই যাও ছোটবৌ, কথা শোন, যাবার আগে একবার পায়ে হাত দিয়ে তার ক্ষমা চেয়ে যাও।"

শশিমুখীর সমস্ত দেহটা কে যেন একবার ঝাঁকি দিয়া দিল,—তীব্র কণ্ঠে বলিলেন, "কেন কি দুঃখে! আমার মাথা কেটে ফেল্‌লেও তা আমি পারবো না দিদি! ওঃ! ভারি তো দায়!"

সরোজবাসিনীর চক্ষু দুইটী ছল ছল করিতেছিল,—তিনি অতি করুণ কণ্ঠে বলিলেন, "কেন পারবে না ছোটবৌ! স্বামীর পায়ে হাত দিতে স্ত্রীর অপমান হয় না। বেশ তো তোমার দোষ না হয়, —নেই আছে, কিন্তু স্বামীকে প্রসন্ন করাই যে স্ত্রীলোকের সব কাজের বড়।"

ছোটবৌ দম্ভভরে উত্তর দিলেন, "কি করবো দিদি, পারলুম না।

আমি যখন নিজে জানি, আমার কোন অপরাধ নেই,— তখন পায়ে ধরতে যাব কেন বলতো। আমি যখন ভগবানের কাছে খাঁটি আছি—তখন কিসের ভয়।”

ছোটবৌয়ের গমনের কথা শুনিয়া পর্যান্ত, সরোজবাসিনীর মেজাজটা একেবারেই খারাপ হইয়া ছিল,—তিনি একটু ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন, “ও সব পাকামোর কথা আমার কাছে ব’ল না। ও সব কথা আমরাও ঢের জানি। এখনও আমার কথা শোন,— নিজের বিপদ নিজে আর ডেকে এনো না। তুমি বুঝতে পারছ না, ঠাকুরপো সত্যিই এবার তোমার ওপর বিরক্ত হয়েছে।”

একটু বিদ্রূপ মিশ্রিত স্বরে শশিমুখী বলিলেন, “তার আর করছি কি বল! তার সন্তোষ বিরক্তিতে আমার বিশেষ কিছু যায় আসে না।”

স্বামীর বিরক্তিতে স্ত্রীর কিছুই যায় আসে না,—এ কথা নারী যে এমন স্পষ্টভাবে বলিতে পারে, তাহা সরোজবাসিনীর একেবারে ধারণাই ছিল না। অসহ্য ব্যথায় ও বিস্ময়ে তিনি স্তম্ভিত হইয়া কিছুক্ষণ ছোটবৌয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সহসা মুখ হইতে কোন কথা বাহির হইল না,—তাঁহার ভিতরটা একেবারে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া বেশ একটু উত্তেজিত ভাবেই তিনি উত্তর দিলেন, “ও দম্ভ থাকবে না ছোটবৌ, যখন বুঝতে পারবে, নিজের কি সর্ব্বনাশ নিজে

করেছ! স্বামীর বিরক্তিতে যায় আসে না, এ কথা মেয়ে মানুষের বলা সাজে না।"

অনর্থক বিলম্বে শশিমুখী ক্রমেই বিরক্ত হইয়া উঠিতে ছিলেন। বড় জা'য়ের এই বিশ্রী কথা গুলায় তাঁহার সমস্ত দেহটায় যেন বিষ ছড়াইয়া দিল। তিনি বিরক্তভাবে উত্তর দিলেন, "সাজে কি না সাজে সে চিন্তা আমার,—তার জন্য পরের মাথা গরম করবার আবশ্যক কি!"

সরোজবাসিনী আবার বলিলেন, "এখনও বল্‌ছি—বোঝ ছোটবৌ! তুমি আমার ঠাকুরপোকে মোটেই চিন্‌তে পারনি। সে যেমন নিরীহ—তেমনি কঠিন। তুমি তার শুধু একটা দিকই দেখেছ, অন্য দিক এখনও দেখনি। বুকের কপাট তার একবার বন্ধ হয়ে গেলে আর জীবন ভোর মাথা খুঁড়লেও তা খুলতে পারবে না।"

কথাটা শুনিয়া, কেবল মুহূর্ত্তের জন্য শশিমুখীর মুখখানা একবার অন্ধকার হইয়া গেল। "না বাপু আমি আর দাঁড়াতে পারি না," বলিয়া যেন বেশ একটু বিরক্তভাবে রান্নাঘরের ভিতর ঢুকিয়া মাথাটা একটু হেট করিয়া সরোজবাসিনীর দুইটা পায়ে হাত দিয়া একটা নমস্কার করিলেন। সরোজবাসিনী তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন বলিলেন, "যখন শুন্‌লে না ছোটবৌ, তখন যাও। তবে মনে রেখ, স্বামীর ভালবাসা হারিয়ে স্ত্রীলোকের বেঁচে থাকার চেয়ে মরাই সহস্র গুণে ভাল।"

ছোটবৌ সে কথার কোন উত্তর দিলেন না—তিনি রন্ধন গৃহ হইতে বাহির হইয়া বরাবর গিয়া একেবারে গাড়ীতে উঠিলেন। সরোজবাসিনী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সদর দরজা পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। গাড়ীখানা দরজা ছাড়িয়া চলিয়া যাইবামাত্র একটা বুক ভাঙ্গা দীর্ঘ নিশ্বাস যেন তাঁহার হৃদয়ের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। টপ টপ করিয়া চক্ষের জলের বড় বড় ফোটা গণ্ড বহিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি আকুল ভাবে পথের পানে চাহিয়া রহিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

শশিমুখী যখন গাড়ীতে গিয়া উঠিয়াছিলেন,—তখন তাঁহার মনের ভিতর কিছুমাত্র চঞ্চলতা ছিল না। খুব একটা নিশ্চিন্ত হইয়াই পিত্রালয়ে যাত্রা করিয়াছিলেন কিন্তু সে ভাবটা অধিকক্ষণ তাঁহার হৃদয়ে স্থায়ী রহিল না। গাড়ী যতই পিত্রালয়ের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই প্রাণটা যেন চঞ্চল হইয়া পড়িতে লাগিল। ছয় বৎসর আজ বিবাহ হইয়াছে, এই সুদীর্ঘ ছয় বৎসরের ভিতর বোধ হয় তিনি ছয় দিনের জন্যও পিত্রালয়ে বাস করেন নাই,—যদিও বা কখন কদাচিৎ যাইতেন তাহাও কেবল এক আধদিনের অধিক তথায় থাকিতেন না। সরোজবাসিনী, স্ত্রীলোকের বাপের বাড়ী যাওয়ার কোন দিনই পক্ষপাতি ছিলেন না। তিনি নিজেও বাপের বাড়ী যাইতেন না; অপরে যে যায় তাহাও পছন্দ করিতেন না। এই সকল কাজগুলা প্রায়ই বাটীর গৃহিণীর মতামতের উপর নির্ভর করে! এক্ষণে বোসেদের বাটীর তিনিই গৃহিণী,—কাজেই শশিমুখীর কিছু দিনের জন্য মৌরসীভাবে পিত্রালয়ে বাস ঘটিয়া উঠে নাই।

কলিকাতার ভাড়াটিয়া গাড়ীর অস্থি-পঞ্জর-চূর্ণকারিণী, ঝন ঝন শব্দে সরোজবাসিনীর খর-তপ্ত কথাগুলা শশিমুখীর কাণের ভিতর

ঘুরিয়া ফিরিয়া ঝন ঝন করিয়া বাজিতে লাগিল। ইহার উত্তাপ যে কত,—এতক্ষণে তাহা যেন শশিমুখীর চৈতন্য হইল। সেই তাপে অভ্রভেদি হিমালয়ের তুষার-স্তূপের ন্যায় তাঁহার অহঙ্কাররাশি প্রাণের ভিতর যেন ধীরে ধীরে গলিতে আরম্ভ হইল। সঙ্গে সঙ্গে অনেক নূতন কথা, মনের ভিতর উকি ঝুকি মারিতে লাগিল। তাঁহার মনে হইল যেন এই ঘনীভূত জলতলে রাশিকৃত কাদা মাটি, আবর্জ্জনা, কর্কশ কঠিন শিলাখণ্ড আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, যাহার কথা একদিনের জন্যও তিনি স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই। সহসা অন্তরের ভিতর হইতে অন্তরাত্মা যেন অট্টহাস্য করিয়া উঠিল, "ভুল,—মহা ভুল করিলে। সত্যই যদি আজ হইতে স্বামী তোমায় পরিত্যাগ করেন,—যাদ কাছে গিয়া বসিলেও ঘৃণায় সরিয়া যান, তাহা হইলে সে কেমন হয়!" কথাটা মনে হইবার সঙ্গে সঙ্গে শশিমুখীর সমস্ত দেহটা কাঁটা দিয়া উঠিল।

কলিকাতায় দুই সারি অট্টালিকা ও বিপণীশ্রেণীর ভিতর দিয়া নানা গলি ঘুরিয়া গাড়ী পিত্রালয়ের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। শশিমুখী গাড়ী হইতে নামিলেন। ভোলানাথ দত্ত কন্যার আগমন অপেক্ষায়েই বাহিরের ঘরে বসিয়াছিলেন। বাড়ীর দ্বারে গাড়ী দাঁড়াইতে দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়াছিলেন। শশিমুখী ধীরে ধীরে গাড়ী হইতে নামিয়া পিতার চরণ-ধূলি গ্রহণ করিলেন। দত্ত মহাশয় কন্যার হস্ত ধরিয়া তুলিয়া,—বেশ একটু হাসিমাখা মুখে বলিলেন, "আমি ভেবেছিলেম বুঝি আজও

ব্যাটারা পাঠালে না। আসবার সময় বেশ ক'রে দু'কথা শুনিয়ে দিয়ে এসেছিস্ তো!"

পিতার কথায় সহসা যেন আজ শশিমুখীর প্রাণটা একবার দুলিয়া উঠিল। তিনি জোর করিয়া একটা শুষ্ক হাসি হাসিবার চেষ্টা করিলেন,—কিন্তু হাসি মুখের উপর ভাসিয়া উঠিল না। পিতার মুখে শ্বশুরালয়ের সম্বোধনটা আজ যেন তাঁহার কাণে খট্ করিয়া বাজিল। শশিমুখী একবার মুখ তুলিয়াই ঘাড় হেঁট করিলেন। ভোলানাথ দত্ত তাহার সুগোল মাথাটা দুলাইয়া অভিমুন্য বধে জয়দ্রথের মত মুখ চোখের ভাব করিয়া আবার বলিলেন, "এ ক'টা দিন প্রাণটা একেবারে উচাটন হয়েছিল। এতক্ষণে একটু নিশ্চিন্ত হওয়া গেল! তুই চ'লে আসবি শুনে পর্য্যন্ত তোর জা'টি নিশ্চয়ই তোকে খুব কষ্ট দিয়েছে! যখন চ'লে এলি, তখন জামাই বাবাজির ভাবটা কেমন দেখে এলি। মুখখানা শুকিয়ে নিশ্চয়ই একেবারে আমসি হ'য়ে গেছে।"

জা'য়ের কথাটা পিতার মুখ হইতে বাহির হইবামাত্র,—আসিবার কালে সরোজবাসিনীর সেই কথাগুলো আবার যেন নূতন করিয়া শশিমুখীর প্রাণের ভিতর তোলপাড় করিয়া উঠিল। মুখে স্বীকার করুন আর না করুন,—বড়জা যে তাঁহাকে কত যত্ন,—কত স্নেহ করিতেন তাহা মনের নিকট গোপন ছিল না। তাঁহার মনে হইল, যেখানে তাঁহার প্রকৃত দাবী তাহা তিনি স্বইচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া আজ যেন পরের ঘরে আসিয়া

একটা মিথ্যা দাবী করিয়া ভিখারিণীর মত দাঁড়াইয়াছেন। স্বামী স্বহস্তে যে লক্ষ্মীর মুকুট মস্তকে পরাইয়া দিয়াছিলেন,—সেই সৌভাগ্যবতী স্ত্রীর মহা গৌরবের পদ ধীরে ধীরে আজ যেন দূরে বহু দূরে,—মহা দূরে সরিয়া যাইতেছে। স্বামীর পদপ্রান্তের চির-আকাঙ্ক্ষার সিংহাসন হইতে কর্ত্তব্যচ্যুত সিপাহীর মত বিতাড়িত হইয়া তিনি আজ যেন পরের রাজত্বে একটুখানি অধিকার গ্রহণ করিয়া ষড়যন্ত্র করিতে উপস্থিত হইয়াছেন।

স্বামী সেই হইতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই, এটা যে লোকের নিকট প্রকাশ করা কি ভয়ঙ্কর [illegible] ব্যাপার, আজ প্রথম শশিমুখী তাহা উপলব্ধি করিলেন। লজ্জায় তাঁহার চক্ষে জল আসিল,—কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। ভোলানাথ দত্ত নিজের মনেই বলিতে লাগিলেন, "এইবার বাবুরা বুঝবেন, ভোলানাথ দত্ত কারুর তেরিয়ার ধার ধারে না। এইবার বুঝিয়ে দেব, একবার তোকে নিতে এলে হয়, যে ভদ্রতাটা কি! আমি যে তোদের বাড়ী মেয়ে দিয়েছি এই না ঢের,—আবার কথা। পরের মেয়েকে ঘরে নিয়ে এলে কত যত্নে রাখতে হয়, সেটা বাবুদের একটু ভাল ক'রে খেয়াল রাখা দরকার। এবার পায়ে ধ'রে দু'ভায়ে মিলে সাধাসাধি করলেও আর তোকে পাঠাচ্ছিনে,—সে ভয় নেই।"

পিতার এই কথাগুলা শশিমুখীর কাণে আজ মহা বিশ্রী অপ্রিয় ঠেকিতে লাগিল। তিনি আর তথায় দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না,—অন্তঃপুরের দিকে অগ্রসর হইলেন। কন্যাকে গমনোদ্যতা

দেখিয়া দত্ত মহাশয় আবার বলিলেন, "চ', এখন বাড়ীর ভেতর,—তোকে জোর ক'রে নিয়ে আসছি ব'লে, তোর নির্ব্বোধ গর্ভধারিণীটি আবার মুখ ভার ক'রে আছেন। আমায় আবার হিতোপদেশ দিতে আসেন,—'শ্বশুরবাড়ীর সঙ্গে কি মেয়ে মানুষের ঝগড়া কর্ত্তে আছে!' মা হ'য়ে মেয়ের কষ্ট বোঝেনা, এমন নির্ব্বোধ বুদ্ধিহীন আর দ্বিতীয় একটী নাই।"

শশিমুখী আর দাঁড়াইলেন না, তিনি অগ্রসর হইলেন। ভোলানাথ দত্তও কন্যার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অন্তঃপুরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া তিনি উঠান হইতেই চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "ওগো বেরিয়ে এস না,—শশি এসেছে যে।"

কন্যার চিন্তায় আনন্দময়ী একেবারেই কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। কন্যাকে আনিবার জন্য লোক যাইবার পর হইতেই তিনি শতেক দেবতার পূজা মানিতেছিলেন। কন্যার এই আগমন বাপার লইয়া পতির সহিত তাহার রীতিমত বিবাদ হইয়া গিয়াছে। সেই হইতে স্বামী স্ত্রীতে একরূপ কথাবার্ত্তা বন্ধ বলিলেই হয়। তিনি রান্নাঘরে বসিয়া মুখখানি চূর্ণ করিয়া মনে মনে বলিতেছিলেন, "কেন মা আমার মেয়ের এমন কুমতি হ'লো, মা আমার মেয়ের সুমতি দাও,—আমি তোমায় জোড়া পাঁঠা দিয়ে পূজো দেব।" সেই সময় পতির স্বর কর্ণে যাওয়ায় মনটা যেন ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। তিনি তাড়াতাড়ি রন্ধন

গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। পত্নীকে বাহির হইয়া আসিতে দেখিয়া, ভোলানাথ দত্ত হাতখানা নাড়িয়া একটা বিশ্রী বিকট হাসিয়া বলিলেন, "নাও শোন,—মেয়ের নিজের মুখে,—কি কষ্টটাই না শ্বশুরবাড়ী পাচ্ছিলো। মুখ্যুর মত তুমিতো একেবারে আমার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দিয়েছ। আমিত আর তোমার মত মুখ্যু নই, যে শ্বশুরবাড়ী ব'লেই আমি আমার মেয়েটীকে মেরে ফেলবো।"

আনন্দময়ীর মনের ভিতর তখন কন্যার ভবিষ্যৎ চিন্তা তাল পাকাইতেছিল,—স্বামীর কথা তাঁহার কর্ণে কতক প্রবেশ করিল, কতক প্রবেশ করিল না। তিনি ভাল মন্দ কোন উত্তরই দিলেন না। জননীকে দেখিয়া শশিমুখী অগ্রসর হইয়া পদ-ধূলি গ্রহণ করিলেন। আনন্দময়ী মায়ের মুখখানি আজ তাঁহারই জন্য নিরানন্দময় দেখিয়া, তাঁহার প্রাণের ভিতরটা যেন একেবারে অন্ধকার হইয়া গেল। লজ্জায় সঙ্কোচে তিনি মুখ তুলিয়া জননীর সহিত কথা কহিতে পারিলেন না। আনন্দময়ীর হৃদয়ে যে প্রবল ঝটিকা বহিতেছিল, কন্যার লজ্জিত ও কম্পিত মুখখানির পানে চাহিয়া তাহা যেন কথঞ্চিত প্রশমিত হইল,—তিনি অতি মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর শ্বশুরবাড়ীর সবাই ভালো আছেন তো! ভাসুরঝির বিয়ে কবে ঠিক হ'লো ?"

ভোলানাথ দত্ত মুখখানা গম্ভীর করিয়া পত্নীর কথার মাঝখানেই বলিয়া উঠিলেন, "ওর শ্বশুরবাড়ীর সবাই ভালো থাক্‌লেন

আর না থাকলেন তাতে আমাদের কি? যাদের সঙ্গে সম্পর্ক-রাখবো না, তাদের কথায় আর প্রয়োজন কি?"

একেই স্বামীর ব্যবহারে আনন্দময়ী জ্বলিয়া যাইতেছিলেন, তাহার উপর কন্যার সহিত প্রথম কথার মাঝেই এরূপ ভাবে বিঘ্ন দেওয়ায় তিনি একেবারে ধৈর্য্যের সীমা হারাইলেন। অতি ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "আচ্ছা তোমার কি কাজ কর্ম্ম নেই, সব কথায় বুঝি কথা না কহিলে আর থাক্‌তে পারো না। যাও না বাহিরে গিয়ে একটু স্থির হ'য়ে বসে একটু কাজ কর্ম্ম করগে—যাও না।"

ভারি যেন একটা হাসির কথা! ভোলানাথ দত্ত হো হো করিয়া হাসিয়া একেবারে দাঁত বাহির করিয়া ফেলিলেন, "শশি, আজ কাল তোর মার মাথাটা একেবারে খারাপ হ'য়ে গেছে। কথায় কথায় গরম হয়ে ওঠেন। ভোলানাথ দত্তের মেয়ে পরের বাড়ী দাসী-বৃত্তি করবে?—তাতে যে তার ইজ্জত যায়, সে হুস্‌ নেই।"

বুদ্ধিমান স্বামীর বুদ্ধির বিকাশ দেখিয়া আনন্দময়ীর একেবারে ঘৃণা হইয়া গিয়াছিল। তিনি বিরক্তভাবে বলিলেন, "তবে তুমিই তোমার মেয়ের সঙ্গে কথা কও, আমি চল্লুম।"

দত্ত মহাশয় তাচ্ছিল্য স্বরে উত্তর দিলেন, "আমি কি আর তোমার ভরসায় মেয়েকে নিয়ে এসেছি। আমার মেয়ে, আমি তার ভাল মন্দ যত বুঝবো, তত কি আর তোমার মতন কাণ্ডজ্ঞান-হীন মানুষ বুঝবে।"

আনন্দময়ীর আর কথা কহিবার ইচ্ছা ছিল না, মুখখানা ভার

করিয়া কন্যার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আয়রে শশি, আমরা ওপরে যাই।"

ভোলানাথ দত্ত বাধা দিলেন, বলিলেন, "দাঁড়াও! তোমার মতন মাথা খারাপ মেয়ে মানুষের ওপর মেয়ের যত্নের ভার দিয়ে তো আর আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারিনে। আগে আমার মেয়ের যত্নের ভার আমার বৌমার উপর দিই।"

কথাটা শেষ করিয়াই ভোলানাথ দত্ত, "বৌমা বৌমা" বলিয়া চাৎকার করিয়া উঠিলেন। একটী খুর খুরে বৌ, বয়স আন্দাজ চৌদ্দ পনর, এক হস্ত পরিমাণ ঘোমটা টানিয়া বস্ত্রে আপাদ মস্তক আচ্ছাদিত করিয়া বাহির হইয়া আসিল। সম্প্রতি বছর দুই তিন হইল আনন্দময়ী তাঁহার একমাত্র পুত্রের বিবাহ দিয়া এই টুক্‌টুকে বৌটিকে গৃহে আনিয়াছিলেন। বধূর নাম উর্ম্মিলা। বধূ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই ভোলানাথ দত্ত গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "বৌমা, আমার মেয়ের ভার তোমার ওপর। আমার বড় আদরের মেয়ে, দেখ যেন যত্নের ত্রুটি না হয়।"

উর্ম্মিলা কথা কহিল না, কেবল একটু ঘাড় নাড়িল। ভোলানাথ দত্ত আবার বলিলেন, "আমি জোর ক'রে মেয়েকে শ্বশুরবাড়ী থেকে নিয়ে এসেছি, দেখ যেন কোন কষ্ট না হয়।"

পিতার ক্রমান্বয়ে এই একঘেয়ে কথায়, শশিমুখীর লজ্জায় মাটিতে মিশিতে ইচ্ছা হইতেছিল। তাঁহার চক্ষের সম্মুখে সমস্ত জগৎ একাকার হইয়া যেন তাহাকে বুঝাইয়া দিতেছিল, লজ্জা, ধর্ম্ম,

সুখ, দুঃখের মহা আবরণরূপ-পতি পরিত্যক্তা-নারীর স্থান জগতের কত নিম্নে। লোকের সম্মুখ হইতে নিজেকে গোপন করিবার জন্য যখন শশিমুখীর সমস্ত প্রাণটা আকুল হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময় উর্ম্মিলা আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া উপরে লইয়া গেল। সে তাহার শয়ন গৃহে শশিমুখীকে বসাইয়া ধীরে ধীরে মুখের অবগুণ্ঠনটা সরাইয়া ফেলিল। শশিমুখী জোর করিয়া কথা কহিলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন "বৌ তুমি কবে এলে ?"

উর্ম্মিলা একটু মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল, "ও মাসের ক'দিন থাকৃতে।"

তারপর একটু নীরব থাকিয়া শশিমুখীর মুখের দিকে চাহিয়া সে হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ ঠাকুরঝি, তুমি নাকি ঠাকুর-জামায়ের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে চ'লে এসেছ। স্বামী দেবতা,— তার সঙ্গে বুঝি আবার কারুর ঝগড়া হয়!"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

শান্তির বিবাহটা কিছুদিন পিছাইয়া গিয়াছিল। আষাঢ় মাসের প্রথমেই বিবাহের দিন স্থির হইয়াছিল বটে কিন্তু সহসা পাত্রের এক দুর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের মৃত্যু হওয়ায় বিবাহ একমাস স্থগিত ছিল। সম্প্রতি বিবাহের দিনটা একেবারে নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে,—গাত্র-হরিদ্রার আর পাঁচ ছয় দিনও বিলম্ব নাই। বিবাহের খুটিনাটি যাহা কিছু আয়োজন সমস্তই শেষ হইয়া গিয়াছে,—বাকি কেবল নিমন্ত্রণ। অপূর্ব্ব উপরের শয়ন কক্ষে বসিয়া তাহারই একটা তালিকা করিতে ছিলেন। শুভবিবাহের লালপত্র ছাপা হইয়া গিয়াছে,—দুই তিন দিনের ভিতর নিমন্ত্রণ গুলা শেষ করিতে হইবে। ভুল ক্রমে পাছে কেহ বাদ পড়িয়া যান, সেই আশঙ্কায় অপূর্ব্ব ভাবিয়া ভাবিয়া একটার পর একটা নাম একখানা লম্বা কাগজে ফর্দ্দ যাত করিতেছিলেন, সেই সময় শান্তি আসিয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। সে এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে অঞ্চলস্থিত চাবির রিংটা নাড়িতে নাড়িতে ধীরে ধীরে আসিয়া পিতার পার্শ্বে বসিল। এই এক মাসেই তাহার দেহের একটু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যেন একটা নূতন সৌন্দর্য্যের আভাস তাহার সমস্ত দেহটী বেষ্টন করিয়া উছলিয়া পড়িতেছে। বিবাহ এমনি

পদার্থ যে, তাহার আয়োজন মাত্রই নারীর যাহা কিছু নারীত্ব,—তাহারা যেন আপনা হইতেই ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া জাগিয়া উঠে। প্রাণের ভিতর মিলন রাগিণী এমনি মধুর আনন্দের সুরে বাজিতে থাকে যে, তাহার প্রতি মুর্চ্ছনায় প্রাণের ভিতর নূতন স্বর্গের সৃষ্টি করে। পর্ব্বত নিবাসিনী ক্ষুদ্র তটিনী পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া, সাগর সঙ্গমে উপস্থিত হইয়া, যেমন পূর্ণ বিকাশে উছলিয়া পড়ে, মিলনের পুর্ব্বে নারীর সেইরূপ সর্ব্বাঙ্গ হইতে একটা নূতন রূপ ফুটিয়া উঠে।

কন্যার পদশব্দে অপূর্ব্ব মুখ তুলিয়া চাহিলেন,—শান্তি তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিবা মাত্র তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "শান্তি, তোর মা কি কচ্ছে রে?"

শান্তি তাহার মধুর হাসিতে সমস্ত ঘরখানি উদ্ভাসিত করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "মা রান্না ঘরে বসে আছে।"

অপূর্ব্ব সেই লম্বা ফর্দ্দখানা মনে মনে পাঠ করিতে ছিলেন, মুখ না তুলিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার রান্না এখনও শেষ হয় নি?"

শান্তি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হাঁ, জায়গা পর্য্যন্ত হয়ে গেছে। মা খালি কাকাবাবুর জন্যে বসে আছে।"

ফর্দ্দখানা পাঠ করা শেষ হইয়াছিল,—তাহাতে আর একটা নাম তুলিতে তুলিতে অপূর্ব্ব বলিলেন, "যা দেকি শিগ্‌গীর তোর মাকে একবার ডেকে আন।"

পিতার আদেশ শুনিয়া শান্তি আর কোন কথা কহিল না,—জননীকে ডাকিয়া আনিবার জন্য নীরবে আবার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। কন্যার চলিয়া যাইবার পর অপূর্ব্ব শয্যা হইতে উঠিলেন,—এক ছিলিম তামাকের আয়োজনের চেষ্টায় নিযুক্ত হইতে যাইতেছিলেন কিন্তু সরোজবাসিনীকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি সে চেষ্টা হইতে বিরত হইলেন। সেই ফর্দ্দখানা পত্নীর হস্তে দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই বেলা দেখ আর কেউ বাদ পড়লো কি না! কাল থেকেই নিমন্ত্রণ কর্ত্তে বেরুতে হবে।"

সরোজবাসিনী সেই ফর্দ্দখানা স্বামীর হস্ত হইতে লইতে লইতে বলিলেন, "নেমত্তন্নের ফর্দ্দতো হ'লো, কিন্তু ছোটবৌয়ের আসার কি হচ্ছে! গায়ে হোলুদের আর মোটে চার পাঁচ দিন বাঁকি, এখনও বাড়ীর বৌ এসে পোঁছিল না। তোমাদের যে সব কি রকম ব্যবস্থা তার কিছুই বুঝিতে পাচ্ছিনে,—আমার তো কোন কাজই গা আস্‌ছে না।"

ছোটবৌয়ের কথায় অপূর্ব্ব যেন একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। ইতিমধ্যে পথে একদিন তাঁহার সহিত ভোলানাথ দত্তের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহাতে তিনি ছোটবৌকে দুই একদিনের মধ্যে পাঠাইবার জন্য বলায়,—ভোলানাথ দত্ত সে কথার কোন উত্তর না দিয়া, মুখখানা এমনি বিশ্রী ভাবে বিকৃত করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, যাহা অপূর্ব্বের চক্ষে একেবারেই ভাল ঠেকে নাই। সেদিন-

কার ভাব ভঙ্গি, চাল চলনে অপূর্ব্ব স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন যে, দত্ত মহাশয় সহজে আর এ বাটীতে তাঁহার কন্যাকে পাঠাইতেছেন না; কিন্তু এ কথাটা তিনি কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। পত্নীর প্রশ্নের উত্তরে একটু দুঃখিত স্বরে বলিলেন, "কেন আমি যে তোমায় শান্তির বিয়ের কথা জানিয়ে ছোটবৌমাকে পাঠিয়ে দেবার জন্যে অনুপমকে দিয়ে ভোলানাথবাবুকে একখানা পত্র লিখতে বলেছিলেম, এখনও বুঝি তা তাকে বলবারই ফুরসোৎ পাওনি?"

সরোজবাসিনী মুখখানা ভার করিয়া বিরক্তভাবে বলিলেন, "ফুরসোৎ আবার পাবোনা কেন? ফুরসোৎও পেয়েছিলেম, বলাও হয়ে ছিলো, কিন্তু তোমাদের ভাই দুইটীর তো আর অন্ত পাওয়া যায় না। তিনি কথাটা হেসেই উড়িয়ে দিলেন। হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন, 'তুমি ক্ষেপেছ বৌদি, যে অশান্তি একবার ঘাড় থেকে নেমে গেছে, তাকে কি আবার কখন মানুষ সেধে বরণ করে ডেকে নিয়ে আসে!' স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া কোন সংসারে হয় না বল; কিন্তু তা বলে কি আর তাঁদের কাটান ছিড়েন হয়ে যায়! তোমার ভাইটী যে একেবারে ধনুক ভাঙ্গা পণ করে বসেছেন।"

অপূর্ব্ব মনে মনে ছোটবৌয়ের আগমন বিষয়ে বিশেষ সন্দিহান হইলেও, সে কথাটা আর পত্নীর সম্মুখে প্রকাশ করিলেন না;— গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "সে জন্যে ভাববার বিশেষ কিছুই নেই। আমি তো কাল নিমন্ত্রণ কর্ত্তে যাচ্ছি,—অমনি ছোটবৌমাকে নিয়ে আসবো অখন।"

স্বামীর কথায় একটা ক্ষীণ আশা যেন নিরাশার ভিতর দিয়া সরোজবাসিনীর হৃদয়ের উপর ভাসিয়া উঠিল। তিনি হাতে যেন স্বর্গ পাইলেন। কয়েক দিন ধরিয়া ছোটবৌকে আনিবার জন্য দেবরকে নানা ভাবে সাধ্য সাধনা আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাকে কিছুতেই সম্মত করিতে না পরিয়া শান্তির বিবাহে ছোটবৌয়ের উপস্থিত সম্বন্ধে তিনি একরূপ হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন, কন্যার বিবাহের অর্দ্ধেক আনন্দ ছোটবৌয়ের পিত্রালয়ে গমনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয় ছাড়িয়া প্রস্থান করিয়াছিল। স্বামীর কথায়, একটা গভীর আনন্দে তাঁহার সমস্ত হৃদয়টা আজ যেন আবার উথলিয়া উঠিল। তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন, "সেই ভালো, চিঠি পত্রে কি আর ও সব কাজ হয়। তুমি কাল সকালেই তা হ'লে ছোটবৌকে নিয়ে এস।"

অপূর্ব্ব একটা ক্ষুদ্র হুঁ দিয়া বলিলেন, "হাঁ তাই হবে। এখন তোমায় যা বল্লুম তাই কর দিকি। একবার আগা গোড়া ফর্দ্দ-খানা পড়ে দেখ, কারু নাম বাদ পড়লো কি না।"

সরোজবাসিনী এইবার ফর্দ্দখানা একবার আগা গোড়া পাঠ করিলেন। ফর্দ্দখানা এমনি সুশৃঙ্খল ভাবে অপূর্ব্বের হাতে সম্পূর্ণ হইয়াছিল যে বড় একটা কাহারও নাম বাদ পড়িবার সম্ভাবনা অল্পই ছিল। ফর্দ্দখানা পাঠ করিয়া সরোজবাসিনী নীরবে কিছুক্ষণ চিন্তা করিবার পর বলিলেন, "কই আর তো কারুর নাম মনে হয় না।"

অপূর্ব্ব আবার কি বলিতে যাইতেছিলেন, শান্তি আসিয়া সংবাদ দিল, "মা কাকাবাবু এসেছেন।"

অনুপমের আগমন বার্ত্তা পাইয়া সরোজবাসিনী তাড়াতাড়ি উঠিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু অপূর্ব্ব বাধা দিলেন, তিনি কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "যা দিকি শান্তি, তোর কাকাবাবুকে এখানে একবার ডেকে নিয়ে আয়।"

শান্তি তাহার কাকাবাবুকে ডাকিয়া আনিবার জন্য বাহির হইতে ছিল, কিন্তু গৃহের দ্বারের নিকট গিয়াই সে আবার ফিরিল, বলিল "এইতো কাকাবাবু এসেছে!"

সে ধীরে ধীরে আসিয়া তাহার পিতার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। অনুপম গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া বিশেষ বিরক্ত ভাবে বলিলেন, "দেখ দিকি বৌদি, তোমায় বল্লেতো আর তুমি শোন না। তোমার জন্যে শুধু শুধু এই অপমানটা হতে হ'লো?"

সরোজবাসিনী দেবরের মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন, তিনি কথাটার কোনই অর্থ খুজিয়া পাইলেন না,—বিশেষ চিন্তিত ভাবে বলিলেন, "কেন,—কি হয়েছে ঠাকুরপো?"

অনুপম তখন পালঙ্কের এক ধারে যাইয়া বসিয়াছিলেন, মুখখানা বেশ একটু গম্ভীর করিয়া বলিলেন, "আমি কি আর না বুঝেই তোমায় বলেছিলেম, যে চিঠি লিখে কাজ নেই। চিঠির উত্তরে শ্বশুর মশাই কি লিখেছেন জান, তিনি তাঁর মেয়েকে এ

বাড়ীতে আর পাঠাতে একেবারেই প্রস্তুত নন। এখানে থাক্‌লে তাঁর মেয়ের নাকি মর্য্যাদা হানি হয়। চিঠি লেখ, চিঠি লেখ করে তো আমায় একেবারে জ্বালিয়ে তুলেছিলে, এখন চিঠি লেখার ফলটা কি হ'লো তাতো দেখলে। এত অপমান হয়েও তোমার যে কেন একটু লজ্জা হয় না বৌদি, এইটুকুই আশ্চর্য্য। তোমার সঙ্গে যে ব্যবহারটি করে গেছেন, অন্য হ'লে তার নামও মুখে আনতো না।"

ভ্রাতার কথা কয়টি শুনিয়া অপূর্ব্বও বেশ একটু গম্ভীর হইয়া পড়িলেন। চিন্তা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বিচার শক্তির প্রাবল্য হওয়ায় তাহার গভীর মন যেন একেবারে মন্থর হইয়া গিয়াছিল। আকাশের জ্যোতির্ম্ময় গ্রহতারা সমস্ত শূন্য জুড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু নিশ্চল মানমন্দির যেমন আপনার যন্ত্রতন্ত্র লইয়া অত্যন্ত সাবধানে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকে, অপূর্ব্বও সেইরূপ তাঁহার পত্নী ও ভ্রাতার মাঝখানে যুক্তিতর্কের পুঁথিগুলি লইয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। সরোজবাসিনী একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "শান্তির বিয়েতে ছোটবৌ আসবে না, তাকি কখন হয়! তাহ'লে এখন বাপু বিয়ে না হয়—দিন কতেক বন্ধ থাক্।"

অনুপম স্বর বেশ একটু চড়াইয়া বলিলেন, "বিয়ে বন্ধ থাক বলিলেই হ'লো। ছোটবৌ যদি মরে যায়, তা হ'লে কি আর শান্তির বিয়ে হবে না।"

সরোজবাসিনী দেবরের কথায় বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন,

"বালাই—ষাট! ওমন কথাও কেউ কখন মুখে আনে। ছি ঠাকুরপো, দিন দিন যে তোমার কি মতি হচ্ছে তা বলাযায় না!"

বৌদিদির এই নীরব তিরস্কারে অনুপমকে চুপ করিয়া যাইতে হইল। চিরকালই তাহাই হইয়া আসিতেছে। প্রথমে তিনি খুব আস্ফালন করিয়া উঠিতেন, কিন্তু বৌদিদির নিকট তিরস্কার খাইয়া বরাবরই তাঁহাকে চুপ করিয়া যাইতে হইত। কথাটায় বৌদি হৃদয়ে ব্যথা পাইলেন দেখিয়া অনুপম একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার এই সঙ্কুচিত ভাব অপূর্ব্বের দৃষ্টি এড়াইল না। তিনি কথাটাকে সেইখানেই চাপা দিয়া, সেই লম্বা ফর্দ্দখানা অনুপমের হস্তে দিয়া বলিলেন, "দেখ্ দিকি কারুর নাম বাধ টাদ্ পড়লো কি না?"

অনুপম ফর্দ্দটা পাঠ করিতে লাগিলেন। দুই তিনটা নামের পরই তাঁহার শ্বশুরের নাম, তিনি আর পাঠ করিতে পারিলেন না। নামের নির্জ্জীব অক্ষরগুলা সহসা যেন সজীব হইয়া আগুনের গোলার মত তাঁহার চক্ষের সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিল, তিনি সেই নামটার উপর অঙ্গুলি দিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "এই নামটা আগে কেটে দেওয়া হক।"

দেবর যে কাহার নামটা কাটিয়া দিতে বলিতেছেন, তাহা বুঝিতে সরোজবাসিনীর বিলম্ব হইল না, তিনি বেশ একটু ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন, "কেন! আত্মীয় কুটুম্বই যদি বাদ দিতে হয়, তবে আর এমন বিয়েতে দরকার কি?"

অনুপম অতি শান্তস্বরে বলিলেন, "এ যে তোমার রাগ করা অন্যায় বৌদি, নিমন্ত্রণ কল্লেও যখন আসবে না, তখন নিমন্ত্রণ করে অপমান হবার দরকার কি ?"

অপূর্ব্ব গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "একজন যদি অভদ্র হয়, তা বলে আমরা কেন অভদ্র হব। কর্ত্তব্য করলে অপমান হয় না।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

কয়েক দিন হইতে ভয়ানক দুর্য্যোগ আরম্ভ হইয়াছে। আজ সন্ধ্যার পর হইতেই বরুণ-রাজ ঘনিভূত জলদজালে বেষ্টিত হইয়া সমরাঙ্গনে নামিয়া পড়িয়াছেন। চঞ্চলা চপলা থাকিয়া থাকিয়া চমকিত হইয়া কড় কড় নাদে আকাশ বাতাস চকিত করিয়া তুলিতেছে। শশিমুখী পিত্রালয়ের একটা নির্জ্জন কক্ষে পালঙ্কের দুগ্ধফেননিভ শয্যার উপর একাকী পড়িয়া পড়িয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছিলেন। সম্মুখে একটা টিপয়ের উপর একটা বাতীদানিতে বাতী জ্বলিতেছিল। আজ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভগিনীপতি আসিয়াছেন, পার্শ্বের গৃহ হইতে, তাঁহার খাওয়ানো দাওয়ানো, গল্প গুজবের অস্ফুট কলধ্বনি যতই ভাসিয়া আসিতেছিল, ততই যেন একটা কিসের অব্যক্ত লজ্জায় তাঁহার সমস্ত হৃদয়টা একেবারে ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

সংসারে কঠিন কর্ত্তব্য হইতে প্রেমকে ফুলের মত ছিড়িয়া লইলে সে যেমন কেবল আপনার রসে আপনাকে সজীব রাখিতে পারে না ;—ধীরে ধীরে আপনা হইতেই ক্রমে বিমর্ষ ও বিকৃত হইয়া আসে। শশিমুখীরও অবস্থা কতকটা সেইরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ফুলদানীতে যতই জল দাও তাহাতে কি ফুল জীবিত থাকিতে

পারে। পিত্রালয়ের অসীম স্নেহ ও যত্নের ভিতরেও, সংসারের দৃঢ় ও প্রশস্ত আশ্রয়ের অভাবে শশিমুখীরও ভিতরটা যেন দিন দিন শুষ্ক হইয়া মুষড়াইয়া পড়িতেছিল। যে এক দিনের অধিক দুই দিন এক সঙ্গে পিত্রালয়ে থাকে নাই, তাঁহার পিত্রালয়ে বাস করা অসম্ভব! শশিমুখী তাঁহার শ্বশুরালয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া পিত্রালয়ে মাতা পিতার স্নেহের ভিতর আপনাকে খাড়া রাখিবার প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন বটে, কিন্তু দিন দিন মন যেন আপনা হইতেই ভাঙ্গিয়া নুইয়া আসিতেছিল।

এক মাসের অধিক হইল তিনি পিত্রালয়ে আসিয়াছেন, তাহার পর জ্যেষ্ঠা ভগিনীও আসিয়াছে। তথাপি ইহারই মধ্যে তাঁহার স্বামী বর্দ্ধমান হইতে তিন চারি বার আশা যাওয়া করিয়াছেন, কিন্তু অতি নিকটে কলিকাতায় থাকিয়াও অনুপম একটী বারও আসেন নাই, এমন কি একখানা পত্র দিয়াও পত্নীর সংবাদ লন নাই। পাছে স্বামীর কথাটা কোন ক্রমে জ্যেষ্ঠা ভগিনীপতির সম্মুখে প্রকাশ হইয়া পড়ে সেই ভয়েই তিনি অসময়ে পলাইয়া এই নির্জ্জন গৃহে আসিয়া ঢুকিয়াছিলেন। স্বামী আসেন না, তাঁহার অবহেলার বেদনা যে কি কষ্টকর তাহা শশিমুখী চিরকাল স্বামীর নিকট থাকিয়া একদিনের জন্যও অনুভব করিতে পারেন নাই। এই এক মাসেই সে ব্যথা তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছিলেন! হৃদয়ের ব্যথা হৃদয়েই সহ্য করিতেছিলেন তাহা প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা অতি অল্পই ছিল, কিন্তু স্বামী ভালবাসেন না, সে যে

নারীর কি ভয়ঙ্কর লজ্জার কথা, তাহা তিনি কোন দিন ধারণাই করিতে পারেন নাই। তাহা যে কেবলি লোকের নিকট গোপান করিয়া ফিরিতে হয়, তাহা যে প্রাণ গেলেও কাহারও নিকট প্রকাশ করা যায় না, তাহা তো তিনি আগে বুঝিতে পারেন নাই।

তাহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীপতিটী জমিদারের পুত্র। পিতার অর্থের অভাব না থাকায়, তিনি কোন দিন লেখা পড়ার ধার ধারেন নাই। দুই একটা কথা কইয়াই শশিমুখী বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার বাহিরটা যেরূপ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ভিতরটা ততোধিক আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ। সন্ধ্যার সময় তিনি একবার মাত্র তাঁহার ভগিনীপতির গৃহে প্রবেশ করিয়া,—বিকট গন্ধে,—তাহার অসংলগ্ন কথাবার্ত্তায় বুঝিয়া আসিয়াছিলেন যে, ভগ্নিপতিটী বিলক্ষণ সুরাপান করিয়াছেন। তাঁহার বিবেচনা শক্তি এমনই অমার্জ্জিত যে শ্বশুরালয়ে সুরাপান করিয়া আসিতেও বিন্দুমাত্রও লজ্জা বোধ করেন নাই; অথচ এই স্বামীর সুখ্যাতি তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মুখে আর ধরে না। এই লোকটির সহিত মনে মনে নিজের স্বামীর তুলনা করায় সমস্ত পৃথিবীটা যেন তাঁহার চক্ষের সম্মুখে অন্ধকার হইয়া আসিল। ইহার তুলনায় তাঁহার স্বামী—দেবতা, তিনি সেই স্বামীকে তুচ্ছ করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন! একটা তীব্র অনুশোচনায় তাঁহার প্রাণটা একেবারে ভরিয়া উঠিয়াছিল,—আর চক্ষের জল কিছুতেই দমন করিতে পারিলেন না। বুকের উপর যেন পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িল; তিনি বালিসে মুখ

লুকাইয়া ফুপাইয়া ফুপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বাহিরে ঝুপ ঝাপ বারি বর্ষণের শব্দে তাঁহার লজ্জা রক্ষা করিল, নতুবা তাহা নিশ্চয়ই প্রকাশ হইয়া পড়িত।

কিছুক্ষণ কাঁদিবার পর শশিমুখী বহুকষ্টে চক্ষের জল নিরোধ করিয়া শয্যা ছাড়িয়া উঠিলেন। গৃহের পার্শ্বস্থিত একটা দেরাজ খুলিয়া কয়েকখানি চিঠির কাগজ ও একটা মসীপাত্র বাহির করিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে আসিয়া আবার শয্যার উপর উঠিলেন। মসীপাত্রটা টিপয়ের উপর রাখিয়া,—বালিসের উপর কাগজগুলি ফেলিলেন। অনুশোচনার তীব্র জ্বালা আজ তাঁহার হৃদয়ের কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। উপায় থাকিলে ছুটিয়া যাইয়া অশ্রুজলে স্বামীর পা দুখানি ভিজাইয়া মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেন। কিন্তু তাহা হইবার আজ আর উপায় নাই।

তিনি যতদূর শুনিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাতে নিশ্চয়ই শান্তির বিবাহ এতদিন হইয়া গিয়াছে। বিবাহের সংবাদটা পর্য্যন্ত জানিতে পারেন নাই। তিনি স্বইচ্ছায় শ্বশুরালয়ের যে পবিত্র সম্বন্ধটা ঘুচাইয়া আসিয়াছেন, তাহা ক্রমে যেন পরিষ্কার হইয়া গেল। ভীতিপ্রদ বিভীষিকা লইয়া ভবিষ্যৎ জীবন চক্ষের সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিল। এই এক মাস কাল তিনি পিত্রালয়ের আসিয়াছেন ইহার ভিতর তাঁহার শ্বশুরালয়ের কোন সংবাদই পান নাই। পাছে নিজের দুর্ব্বলতা প্রকাশ হইয়া পড়ে, সেই আশঙ্কায় এতদিন তাহা কাহারও নিকট জিজ্ঞাসা

করিতেও সাহস হয় নাই। আর কোন্ মুখেই বা জিজ্ঞাসা করিবেন, সে মুখ কি আর তাঁহার আছে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করা লোকের নিকট হাস্যাস্পদ ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাই আজ প্রাণের আবেগে তিনি লেখনি লইয়া স্বামীর নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতে বসিয়াছিলেন, কিন্তু অশ্রুজলে লেখনি কিছুতেই অগ্রসর হইতেছিল না। চক্ষের জলের বড় বড় ফোঁটা কাগজের উপর ঝরিয়া পড়িয়া সমস্ত লেখা মুছিয়া দিতেছিল। বহু কষ্টে প্রাণপণ শক্তিতে অশ্রুজল দমন করিয়া কোন ক্রমে পত্র খানা শেষ করিলেন, কিন্তু পড়িতে গিয়া দেখিলেন মনের ভাব কিছুই পরিস্ফুট হয় নাই। লেখা সমস্তই অসংলগ্ন হইয়া গিয়াছে। ভাব এমনি বিশ্রীভাবে বিকাশ হইয়াছে যে তাহার কোনই অর্থ হয় না। লজ্জায় তাড়াতাড়ি সেখানা টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। পুনঃরায় লিখিতে আর তাঁহার সাহস হইল না, তিনি বালিসের ভিতর মুখ লুকাইয়া প্রাণের জ্বালা অশ্রুজলে ধৌত করিতে লাগিলেন।

জ্যেষ্ঠ জামাতার আহারের ব্যবস্থা লইয়াই সন্ধ্যা হইতে আনন্দময়ী ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাই এতক্ষণ শশিমুখীর খোঁজ পড়ে নাই। জামাতার আহার হইয়া যাইবার পর তিনি শশিমুখীর খোঁজে উপরে আসিলেন। জ্যেষ্ঠ জামাতা আসিয়াছেন কাজেই কনিষ্ঠ জামাতার কথাটা থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার মনের ভিতর ঘুরিয়া ফিরিয়া উঁকি মারিতে ছিল। কন্যা পিত্রালয়ে

আসিবার পর আজ এক মাসের উপর হইতে চলিল কনিষ্ঠ জামাতার তিনি কোন সংবাদই পান নাই; সংবাদ লইবারও উপায় নাই, সে সম্বন্ধে স্বামীকে কোন কথা বলিলে তিনি একবারে উগ্রমূর্ত্তি হইয়া উঠেন। ভোলানাথ দত্ত কনিষ্ঠ জামাতার সহিত আর কোন সম্পর্ক রাখিবেন না, সে বিষয়ে তিনি একবারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কয়েক দিন হইতেই শশিমুখীর অস্ফুট বেদনা মুখে চোখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা আনন্দময়ী লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং সেইজন্যই আজ যেন তিনি কন্যার জন্য অধিক পরিমাণেই চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাই জামাতার আহারের পরই তিনি কন্যার খোঁজে উপরে আসিয়াছিলেন। উপরে এ ঘর সে ঘরে শশিমুখীকে না দেখিয়া তিনি একেবার তাহার শয়ন গৃহে প্রবেশ করিলেন। কন্যাকে এরূপভাবে একাকী শয্যায় পড়িয়া কাঁদিতে দেখিয়া মায়ের প্রাণ আকুল হইয়া পড়িল; তিনি বিশেষ ব্যস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁরে শশি, কি হয়েচেরে তোর! এমন সময়ে একলাটি শুয়ে কাঁদছিস্ কেন? অসুখ বিমুখ করেনিতো?"

শশিমুখী প্রাণের জ্বালায় এমনি উৎপীড়িত হইয়া পড়িয়াছিল যে মায়ের গৃহ প্রবেশ পর্য্যন্ত জানিতে পারেন নাই,—জননীর স্বর কর্ণে যাওয়ায় তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া উঠিয়া বসিলেন। প্রাণপণ বলে নিজেকে সামলাইয়া উত্তর দিলেন, "কই না কাঁদিনি তো।"

কই না কাঁদিনি তো বলিলেই কি আর কান্না ঢাকা যায়,—অশ্রু

সরিয়া যাইলেও সে যে মুখ চোখের উপর একটা কাল ছাপ মারিয়া প্রমাণ রাখিয়া যায়। আনন্দময়ী কন্যার মনের অবস্থা বুঝিলেন। অনুশোচনায় যে প্রাণের মলা কাটিতে আরম্ভ হইয়াছে তাহা তিনি পূর্ব্বেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন শেষ যে অশ্রুজল ধুইয়া পুছিয়া প্রাণটা একেবারে নির্ম্মল করিয়া দিবে, তাহাও তিনি জানিতেন। কন্যার নয়নে অশ্রু দেখিয়া প্রাণে ব্যথা পাইলেন সত্য; কিন্তু মনে মনে আনন্দিত না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। সে যে এত শীঘ্র বুঝিতে পারিয়াছে স্বামী কি,—স্বামীর ঘর কত পবিত্র,—মর্ত্তে সতীর-স্বর্গ,—ইহাতে কোন জননীর প্রাণ আনন্দে না ভরিয়া উঠে। যে স্বর্গচ্যুত হইয়া নারী মর্ত্তে ষড়ৈশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিলেও সুখী হইতে পারে না, ইহা যে এত শীঘ্র কন্যা বুঝিয়াছে ইহাই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সন্তোষ। তিনি মনের ভাব গোপন করিয়া মৃদু স্বরে বলিলেন, "তা এমন একলাটি চুপ করে শুয়ে আছিস্ কেন! চ,' ওঠ—খাবিনি, রাত যে ঢের হয়েছে!"

শশিমুখীর পেটের ভিতর তখন চিন্তার ঢেউ বহিতেছিল,—আহারে একেবারেই রুচি ছিল না; জননীর কথায় ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন,—"না মা আজ আর আমি খাব না। ক্ষিধে একেবারেই হয়নি।"

আনন্দময়ী আর মনের ভাব দমন করিতে পারিলেন না, একটু রুষ্ট স্বরে বলিলেন, "কেন, কি খেয়েছিস্ যে ক্ষিধে হয়নি। তোর যে সকল তাতেই বাড়াবাড়ি।"

কিসের ইঙ্গিত করিয়া জননী যে এই কথা বলিলেন, শশিমুখী তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না! জননী কি তাঁহার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছেন! তিনি একবার ঈষৎ একটু মস্তক তুলিয়া আবার তাহা অবনত করিলেন। আনন্দময়ী কন্যাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া পুনঃরায় বলিলেন "নে এখন ওঠ,—খাবি চ'। কাল মিষ্টি করে অনুপমকে একখানা চিঠি লিখে দিস্। সে তেমন ছেলে নয়,—তা'হলেই এসে নিয়ে যাবে অথন।"

মায়ের কথায় শশিমুখীর সমস্ত দেহটা যেন রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। বহুকষ্টে যে অশ্রু সে দমন করিয়াছিল, তাহা যেন তোলপাড় করিয়া দুই চোখ ভাসাইয়া ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল। শশিমুখী তাড়াতাড়ি অঞ্চলে বদন আবৃত করিলেন। কন্যার গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিতে দেখিয়া মায়ের প্রাণ গলিয়া গেল, আনন্দময়ী অতি মধুর স্বরে কন্যাকে সান্ত্বনা করিতে যাইতেছিলেন কিন্তু জ্যেষ্ঠা কন্যাকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া নীরব হইলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা ঊষা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হা মা, শশি কাঁদছে কেন, ওর কি হয়েছে?"

আনন্দময়ী মৃদু হাসিয়া উত্তর দিলেন, "ওর শ্বশুরবাড়ীর জন্যে মন কেমন কচ্ছে।"

"নেকামি দেখে আর বাঁচিনি," মুখখানার উপর একটা তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ করিয়া ঊষা গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। জ্যেষ্ঠা ভগ্নির শ্লেষ ব্যঞ্জক স্বরে শশিমুখীর সমস্ত দেহটার

এ

কে যেন সজোরে চাবুক মারিল। লজ্জায় ঘৃণায় তিনি যেন মরমে মরিয়া গেলেন। ঊষার বচনের ঘটায়, গমনের ভঙ্গিমায় আনন্দময়ী মনে মনে বিশেষ বিরক্ত হইলেন, কিন্তু কোন দিনই তিনি মুখ ফুটিয়া কাহাকেও কিছু বলেন নাই, আজও বলিলেন না। কেবল কন্যার আচরণে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। জননী ও কন্যা উভয়েই নীরব, কেবল বাহিরে কলিকাতার সার্সি খড়-খড়ীযুক্ত গবাক্ষের আসে পাশে বৃষ্টির ঝুপ ঝাপ শব্দে, বাতাসের সাঁই সাঁই রবে বিরাট কোলাহল চলিতে লাগিল। শশিমুখীর মনে হইতেছিল তাঁহাকেই যেন তিরস্কার করিবার জন্য প্রকৃতির আজ এই কোলাহল।

সেই নির্ব্বাক কক্ষে প্রবেশ করিয়া ঊর্ম্মিলা সংবাদ দিল, "মা, তোমায় বাবা একবার ডাকছেন।"

বধূর আহ্বানে আনন্দময়ী একটু বিচলিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, হঠাৎ যে আমায় ডাক্‌ছেন?"

ঊর্ম্মিলা মৃদু হাসিয়া বলিল, "তাতো জানিনে মা।"

আনন্দময়ী বধূর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "বৌমা তুমি শশীকে নিয়ে এস, আমি দেখি আবার ডাক্‌ছেন কেন? কাঁদিস্‌নে শশী, আমি কালকেই তোকে পাঠিয়ে দেব।"

আনন্দময়ী চলিয়া গেলেন। ঊর্ম্মিলা পালঙ্কের নিকট আসিয়া শশিমুখীর হাতখানি ধরিয়া বলিল, "এস ছোট্‌ ঠাকুরঝি,—ছি ভাই, এমন করে কি কাঁদতে আছে! নিজের দুর্ব্বলতা এমন করে নিজে

প্রকাশ কল্লে লোকে যে হাসবে। তোমার কি এমন করে কাঁদা সাজে।”

উর্ম্মিলার এই সুন্দর মধুমাখা কথাগুলি শশিমুখীর মরমে যাইয়া যেন একটা শান্তি প্রলেপ মাখাইয়া দিল। তিনি অঞ্চলে চক্ষের জল মুছিয়া ফেলিয়া পালঙ্ক হইতে নামিয়া আসিলেন। উর্ম্মিলা তাঁহার হাত ধরিয়া নিম্নে লইয়া গেল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

স্নিগ্ধ-মধুর শুভ্র-উষা প্রভাতের আলোকে ফুটিয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে সূর্য্যের কিরণ প্রখর হইয়া উঠিল। কর্ম্ম কোলাহল মুখরিত কলিকাতা সহর তখন রীতিমত একেবারে সজাগ হইয়া উঠিয়াছে।

কন্যা শ্বশুরালয়ে যাইবার জন্য কাঁদিয়াছে, এ সংবাদটা দত্ত মহাশয় রাত্রেই পত্নীর নিকট পাইয়াছিলেন। কিন্তু কথাটা তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তাঁহার গর্ব্বিত কন্যা শ্বশুরালয়ে যাইবার জন্য কাঁদিতে পারে এ জিনষটা তাঁহার নিকট একবারে সম্পূর্ণই নূতন। শ্বশুরালয় হইতে পিত্রালয়ে আসিবার জন্যই স্ত্রীলোক কাঁদিয়া থাকে, কিন্তু শ্বশুরালয়ে যাইবার জন্য কেহ যে কোন দিন কাঁদিয়াছে তাহা তিনি শোনেনও নাই। পত্নীর এই অস্বাভাবিক কথাটা শুনিবামাত্র তিনি এমনি বিশ্রী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়াছিলেন যে কথাটা দ্বিতীয়বার পাড়িতেও আনন্দময়ীর একেবারে ঘৃণা হইয়া গিয়াছিল।

কথাটার সত্য মিথ্যা প্রমাণ করিবার জন্য ভোলানাথ দত্ত প্রত্যুষে উঠিয়াই কন্যাকে বাহিরের ঘরে ডাকিয়া পাঠাইয়া ছিলেন। কন্যা তখনও উপস্থিত হয় নাই। কন্যার মুখে সত্য কথাটা জানিয়া

লইয়া, পত্নীকে বেশ করিয়া কয়েকটা মিষ্ট কথা কি কি শুনাইয়া দিবেন একাকী বসিয়া মাথাটা নাড়িয়া নাড়িয়া তাহাই তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে ছিলেন।

পিতার আহ্বান যথা সময়ে শশিমুখীর কর্ণ গোচর হইবা মাত্র তিনি ধীরে ধীরে আসিয়া পিতার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ভোলানাথ দত্ত একবার তাঁহার বড় বড় চোখ দুইটা বেশ একটু বিস্ফারিত করিয়া কন্যার আপাদ মস্তক লক্ষ্য করিলেন। তাঁহার স্থূল দৃষ্টি কন্যার কোনই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে পারিল না। কন্যার দিকে চাহিয়া বেশ একটু মুচ্‌কি হাসিয়া বলিলেন "তোর মায়ের কথাবার্ত্তা গুলো শুনিস্‌নিতো। তুই নাকি শ্বশুরবাড়ী যাবার জন্যে দিনরাত চথের জল ফেল্‌ছিস্‌। আজ তোকে শ্বশুরবাড়ী না পাঠিয়ে দিলে তিনি একবারে মাথামুড় খুঁড়ে মরবেন। এই নিয়ে কাল রাত্রে একেবারে একটা হুলুস্থূল কাণ্ড। তার কাণ্ড দেখে আমি আর হেসে বাঁচিনি। আরে আমি বুঝিনি ;—আমার মেয়ে কি সেই রকম। শ্বশুরবাড়ী যাবার জন্যে নাকি মেয়েমানুষ আবার কখনও কাঁদে! তোকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাবার জন্যে তোর মায়ের এত মাথাব্যাথা কেন বল্‌তে পারিস্‌?"

মেয়ের উত্তরটা শুনিবার জন্য দত্ত মহাশয় নীরব হইলেন, কিন্তু রাজ্যের লজ্জা চারিদিক হইতে আসিয়া শশিমুখীকে এমনি ভাবে জড়াইয়া ধরিয়াছিল যে তাঁহার গলার স্বর পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া

গিয়ছিল। মায়ের কথাটা, যে সত্য, মুখ ফুটিয়া সেইটুকু বলাও তাঁহার অসাধ্য হইল। নিজের দুর্ব্বলতা নিজে কেহ কি কোন দিন প্রকাশ করিতে পারে! শশিমুখী লজ্জিত আননে, কম্পিত হৃদয়ে হেঁটমুণ্ডে পিতার সম্মুখে নির্জীব জড় পদার্থের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। দত্ত মহাশয় কন্যার এ মৌনের অর্থ কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। কন্যাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া তাঁহার ধারণাটাই একেবারে অভ্রান্ত সত্য মনে মনে ঠিক করিয়া, আবার আরম্ভ করিলেন, "এই কথাটাই তোকে বলবার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছিলেম কিন্তু সে জন্যে তোর কোন চিন্তা নেই। তোর মায়ের মাথা গরম হয়ে গেছে, তার কথা মোটেই ধরিস্‌নে। আমি বেঁচে থাকা পর্য্যন্ত কেউ তোকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাতে পাচ্ছে না। আর আমার মরবার পরও তোর শ্বশুরবাড়ী যাবার কোন প্রয়োজন হবে না। আমি তোর জন্যে এমন ব্যবস্থা করে যাব যে জীবনে কখনও তোর অন্নের জন্যে পরের কাছে হাত পাততে হবে না।"

কিন্তু শুধু অন্নের অভাব না থাকিলেই কি জীবনের পরিপূর্ণ তৃপ্তি হইতে পারে? স্নেহশূন্য প্রেমশূন্য জীবন যখন রাজপুতানার মরুভূমির মত ধূ ধূ করিতে থাকে, তখন অন্ন কি আর মুখে উঠিতে চায়! তখন যে সমস্ত বিশ্বের অন্নের পরিবর্ত্তে এক বিন্দু প্রেম, একটুখানি স্নেহের জন্য সমস্ত প্রাণ আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠে। পিতার অন্নে জীবন যাপন, সে যে নারীর মহা অভিসম্পাত,—তাই

আজ অন্নের কথায় শশিমুখীর প্রাণে আঘাত লাগিল, নয়ন প্রান্তে জল আসিল। পাছে পিতার সম্মুখে অশ্রুজল গণ্ড বহিয়া ঝরিয়া পড়ে, তাই তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন। দত্ত মহাশয় একটু নীরবে থাকিয়া পুনরায় বলিলেন, "যা তোর মাকে এই কথাটা একবার বেশ করে বুঝিয়া বলগে যা,—আমি তো আর তোমার খাচ্ছিওনি পরচ্ছিওনি, আমাকে তাড়াবার জন্যে তুমি এমন কোমর বেঁধে লেগেছ কেন?"

মায়ের উপর এরূপ মিথ্যা দোষারোপ শশিমুখী সহ্য করিতে পারিলেন না। জননী তাঁহাকে তাড়াইবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছেন! আর নীরব থাকিলে এ কথাটাও তাঁহাকে স্বীকার করিয়া লইতে হয়। কিন্তু মিথ্যার প্রশ্রয় দেওয়া শশিমুখীর পক্ষে অসম্ভব। তাঁহার অনেক দোষ ছিল সত্য, কিন্তু তিনি যদি একবার বুঝিতে পারিতেন যে এইটা তাঁহার দোষ, তাহা হইলে তখনই তাহার প্রতিকারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টায় নিযুক্ত হইতেন। কাজেই তিনি আর নীরব থাকিতে পারিলেন না। প্রাণপণ বলে গলাটাকে পরিষ্কার করিয়া পিতার কথাটার প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিলেন কিন্তু আর কথাটা আর বলা হইল না, বৈটখানার সম্মুখের দ্বার দিয়া অপূর্ব্বকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি যেন একবারে জড়সড় হইয়া পড়িলেন, তাড়াতাড়ি মাথার কাপড়টা রীতিমত টানিয়া দিয়া পশ্চাতদিকস্থ দরজা দিয়া অন্তঃপুরের ভিতর প্রবেশ

করিলেন। গৃহ হইতে বাহির হইয়া অন্তঃপুরের দিকে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া সহসা তিনি একেবারে থমকাইয়া দাঁড়াইলেন। কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য নীরবে কি চিন্তা করিলেন, তাহার পর আবার ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিয়া বৈটকখানার দ্বারের অন্তরালে দাঁড়াইলেন। ভাসুর সহসা কেন আসিলেন; পিতার সহিত তাঁহার কি কথা হয়, তাঁহার শ্বশুরালয়ের গমন সম্বন্ধে কোন কথাবার্ত্তা উঠে কি না, প্রভৃতি শুনিবার জন্য আজ এমনি একটা কৌতুহল তাঁহাকে ব্যতিবস্ত করিয়া তুলিল যে, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া চোরের ন্যায় দরজার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইতে হইল।

অপূর্ব্বকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া ভোলানাথ দত্ত তাড়াতাড়ি মুখখানা রীতিমত ভার করিয়া ফেলিলেন। অপূর্ব্ব যখন নিকটে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, তখন দত্ত মহাশয় বিরক্ত ভাবে জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া আকাশের পানে চাহিয়াছিলেন। তিনি অপূর্ব্বকে যেন দেখিয়াও দেখিলেন না; এমন কি একবার বসিতে পর্য্যন্তও বলিলেন না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও ভোলানাথ দত্তের মুখে একটা কথাও শুনিতে না পাইয়া, বাধ্য হইয়া অপূর্ব্বকে আপনা হইতেই বসিতে হইল। তিনি আজ ছোটবৌমাকে লইয়া যাইবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেই কথাটার একটা মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে অপেক্ষা করিতেই হইবে। কাজেই না বলিলেও তাহাকে বসিতে হইল। এরূপ ভাবে মানুষ কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে!

ভোলানাথ দত্তের বিনা বাক্যব্যয়ে ঘুরিয়া বসিবার রকম দেখিয়াই তাঁহার মনের ভাবটা অপূর্ব্বের আর বুঝিতে বাকি রহিল না। মানুষ বাড়ীতে আসিলে মানুষ যে তাহার সহিত এমন ব্যবহার করিতে পারে এটা তাহার পূর্ব্বে জানা ছিল না। তাই তিনি প্রথমে একটু বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। মনের ভাবটা লোকের সম্মুখে প্রকাশ করা তাঁহার কোন দিনই স্বভাব নহে। দত্ত মহাশয় যখন কিছুতেই কথা কহিলেন না, তখন বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে কথা পাড়িতে হইল। তিনি বেশ একটু মিহিস্বরে বলিলেন, "আজ্ঞে শান্তির বিয়ে সামনের মঙ্গলবার। গায়েহলুদের মাঝে আর একটা দিনও নেই। তাই ছোটবৌমাকে নিয়ে যাবার জন্যে আমাকেই আস্‌তে হ'লো। আজ যদি তাঁকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দেন্ তা'হলে সব দিকেই সুবিধে হয়। বিয়ের দিন আপনারও পায়ের ধূলো পড়া চাই;—অতুলও যেন যায়।"

"যাবে বইকি", দত্ত মহাশয়ের স্থূল দেহটা সটাক মস্তক সহিত একটু ঘুরিয়া একেবারে অপূর্ব্বের সম্মুখিন হইল। তাঁহার মুখের ভাবখানা এমনি বিশ্রী বিকৃত হইয়াছিল যে, অপূর্ব্ব সোদকে একবার মাত্র চাহিয়াই মস্তক নত করিলেন। উত্তরটা শুনিয়া তিনি একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছিলেন, সেই বিকৃত মুখখানার প্রতি চাহিতেও তাঁহার যেন লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। তিনি নিজেকে রীতিমত সংযত করিয়া, চুপ করিয়া রহিলেন।

অপূর্ব্বকে বৈটকখানায় প্রবেশ করিতে দেখিয়াই, ভোলানাথ দত্ত সমরের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন;—কেবল একটা কথা পাড়িবার অপেক্ষা—দু' কথা বেশ করিয়া শুনাইয়া দিবাব এমন সুযোগ কি তিনি ছাড়িয়া দিতে পারেন! তীব্র রুঢ়কণ্ঠে তখনি সুরু করিলেন, "তোমার মেয়ের বিয়ে, তা আমাদের কি! তোমরা কি ভদ্রলোকের সঙ্গে আচার ব্যবহার কর্ত্তে জান! তোমাদের বাড়ীতে কি কোন ভদ্রলোক যায়! আমিতো তোমার ছোট ভাইটিকে স্পষ্টই সেকথা লিখে দিয়েছি, যে আমি তোমাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে একেবারেই নারাজ।"

অপূর্ব্ব মুখ তুলিয়া চাহিলেন, তিনিও সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন, অতি মিনতি পূর্ণ স্বরে বলিলেন, "জামাই আপনার ছেলের মত,—তার যদি কোন দোষ হয়ে থাকে, তাকে শাসন করুন। জামায়ের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখতে হলে, আপনার মেয়ের সঙ্গেও যে সম্পর্ক থাকে না। বাপ হয়ে তো আর মেয়েকে পর কর্ত্তে পারবেন না।"

ভোলানাথ দত্ত বেশ একটু তীব্রস্বরে উত্তর দিলেন, "মেয়ে আমার পর হবে কোন্ দুঃখে! আমার কাছে স্পষ্ট কথা, আমি ঢাকঢাক লুকোচুরিতে নেই। মেয়েকেও তোমাদের বাড়ী আর পাঠাচ্ছিনে,—তোমাদের সঙ্গেও কোন সম্পর্ক রাখবো না। তোমরা যা ইচ্ছে কর্ত্তে পারো। মেরে ফেলবার জন্যেতো আর আমি মেয়েটী পাঠাব না। তোমাদের বাড়ীতে কষ্টে কষ্টে আমার মেয়ে মর্ত্তে বসেছিল।"

'তোমাদের বাড়ীতে কষ্টে কষ্টে আমার মেয়ে মর্ত্তে বসেছিল' এ কথাটায় অপূর্ব্ব হৃদয়ে বেদনা অনুভব করিলেন। তাঁহার দেহের ভিতর যেন একটা তড়িত প্রবাহ ছুটিল কিন্তু তথাপি মনের ভাবটা গোপন করিয়া তিনি কষ্টে মুখে একটু হাসি আনিয়া আবার বলিলেন, "আপনার মেয়ের যদি সেখানে কষ্ট হয়, তা'হলে তাকে পাঠাতে বল্‌তে পারিনে। তবে না হয় এই বিয়ের কদিনের জন্যই ছোটবৌমাকে পাঠিয়ে দিন। বিয়ের পরেই আবার নিয়ে আসবেন। বাড়ীতে বিয়ে, বাড়ীর বৌ, না যাওয়া কি ভাল। এক আধ্‌দিন একটু কষ্ট হলেও সেখানে থাকাই উচিত।"

দত্ত মহাশয় বিকৃত কণ্ঠে বলিলেন, "উচিত অনুচিত আর আমায় শিখিও না। উচিত অনুচিত আমরা বিলক্ষণ জানি! আমি আমার মেয়েকে তোমাদের বাড়ী এক ঘণ্টার জন্যও পাঠাব না,—দেখি তোমরা কি কর্ত্তে পার! যাদের সঙ্গে আমি সম্পর্ক রাখতে চাইনি, তারা অনর্থক আর যেন না আমার বাড়ী আসে। আমার মেয়েতো বিধবা। অমন জামায়ের বাঁচার চেয়ে মরাই ভালো।"

ক্রোধের বহ্নি বহুক্ষণ হইতেই অপূর্ব্বের ভিতরে জ্বলিতেছিল, কিন্তু আর বুঝি তাহাকে চাপিয়া রাখা যায় না। তিনি প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সংযত করিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এরূপ স্পষ্ট ভাবে ভায়ের অকল্যাণ ভায়ের সম্মুখে প্রচার করিতে যাহার বাধে না; সেই উন্মাদের প্রলাপ শুনিতে তাঁহার আর মোটেই ইচ্ছা ছিল না। কেবল একটি

ক্ষুদ্র বেশ বলিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। তিনি যেমন আনন্দে গৃহ হইতে বাহির হইয়াছিলেন সেইরূপ নিরানন্দ লইয়া গৃহে ফিরিলেন।

শশিমুখী বৈটকখানার দরজার অন্তরালে দাঁড়াইয়া পিতা ও ভাস্বরের সমস্ত কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন,—ভাস্বরের উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার যেন চারিদিক হইতে সমস্ত অবলম্বন খসিয়া পড়িল,—শরীরের সমস্ত স্নায়ুপেসী একেবারে হাল ছাড়িয়া দিল,—নিশ্বাস লইবার জন্য যেন বাতাসটুকু পর্য্যন্ত রহিল না,—সূর্য্য সমস্ত আলো তাঁহার সম্মুখ হইতে সরাইয়া লইলেন। ডাঙ্গার উপর পড়িয়া মাছ যেমন খাবি খায়, তাঁহার বুকের ভিতরটা ঠিক তেমনি করিতে লাগিল। মজ্জমান ব্যক্তি যেমন কোন একটা অশ্রয় পাইবার জন্য উপরে হস্ত প্রসারিত করিয়া আকাশ খুজিয়া বেড়ায়, শশিমুখীও তেমনি একটা যা হয় কিছু প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিবার জন্য একান্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু আসে পাশে চারিদিকে একখানি তৃণ না দেখিতে পাইলে মুজ্জমান ব্যক্তি যেমন জীবন আশায় একেবারে হতাশ হইয়া শক্তি থাকিতেও ভয়ে বিবর্ণ হইয়া হাত পা ছাড়িয়া দিয়া একেবারে জলের তলে নামিয়া যাইতে থাকে; শশিমুখীও আজ যেন চারিদিক শূন্য দেখিয়া ধীরে ধীরে নিরাশার ভিতর ডুবিয়া যাইতে লাগিলেন। ভাস্বরের ওই একটু খানি "বেশ" শব্দটা যেন সজীব হইয়া একটা বিকট রাক্ষসের মত তাঁহাকে গিলিবার জন্য আসে পাশে ঘুরিতে লাগিল। তিনি

ওই একটু খানি "বেশ" যে বজ্রের অপেক্ষাও কঠিন, পাশুপতের চেয়েও মারাত্মক শশিমুখী তাহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন, তাঁহার পদতলে মেদিনী দুলিতে লাগিল—বুকভাঙ্গা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

ভাসুরের প্রতি পিতার অভদ্র ব্যবহারে কিছুক্ষণের জন্য শশিমুখীর চৈতন্য পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু সচেতন হইবামাত্র একটা তীব্র বেদনা তাঁহার সমস্ত দেহটা যেন একেবারে দগ্ধ করিয়া দিল। নিজের ভুল বুঝিয়া পর্য্যন্ত শশিমুখীর অনুশোচনায় সমস্ত প্রাণটা থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু নিজের দুর্ব্বলতা পাছে প্রকাশ হইয়া পড়ে সেই লজ্জায় প্রাণের বেদনা প্রাণের ভিতরই চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। এত অপমানেও ভাসুরের সেই স্নিগ্ধ প্রশান্ত মুখখানি লক্ষ্য করিয়া তিনি আর আজ নিজেকে কিছুতেই সামলাইতে পারিলেন না। পিত্রালয়ে ভাসুরের অপমানিত হওয়ার অর্থ যে, তাঁহার নিজেরই অপমানিত হওয়া। হৃদয়ের ভিতর হইতে কে যেন আজ সেই কথাটাই বারবার তাঁহাকে চীৎকার করিয়া বলিয়া দিতে লাগিল। এই মহাবেশশূন্য প্রভাত রৌদ্রে শশিমুখী আজ নারীর কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার যতদূর দৃষ্টি যায় তিনি একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন,—সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া,—সমস্ত নারী স্বামীর গৃহে নিজ নিজ আসন সুদৃঢ় করিতে আপন কর্ত্তব্য লইয়া ছুটিয়াছে। বিধি প্রদত্ত চির আশ্রয় স্বামীর-গৃহে,—সতীর-স্বর্গে নূতন পিতা মাতা,

ভ্রাতা ভগ্নির ভিতর স্নেহের ভারে ফুলের মত সুরভি বিলাইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। আর তিনি সমস্ত আত্ম-গৌরব পঙ্কের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া, সমস্ত নারী জীবনটাকে একেবারে ব্যর্থ করিতে বসিয়াছেন!

ভাবের ভাঁটায় হৃদয়-তলস্থিত সমস্ত প্রচ্ছন্ন পঙ্ক শশিমুখীর চক্ষের সম্মুখে একেবারে বাহির হইয়া পড়িল। এই ধিক্কৃত জীবন হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া শ্বশুরালয়ে লইয়া যাইবার জন্য তিনি একেবারে ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। শ্বশুরালয়ের লইয়া শান্তি, প্রেম, স্নেহ আজ তাঁহার কাছে দুর্লভতম অমৃত বলিয়া বোধ হইল। দৈন্যের দীর্ঘশ্বাস;—অভাবের হাহাকারের ভিতরেও স্বামীর গৃহে, সতীর-স্বর্গে যে পবিত্র শান্তি; ঈশ্বরের মঙ্গল আশীর্ব্বাদের মত নারীর মস্তকে নিয়ত বর্ষিত হয় তাহা যে স্বর্গাপেক্ষাও গৌরবের, আজ তাহা শশিমুখী প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন। 'আমি শ্বশুরালয়ে যাইব,' এই কথাটা প্রাণের ভিতর উচ্চারণ করিবার পর হইতেই তাঁহার মনে একটা নূতন আনন্দের আবির্ভাব হইল। এই এক মাস কাল যে অবিশ্রাম চিন্তাভার তিনি বহন করিয়া আসিতেছিলেন তাহা যেন অনেকটা হাল্‌কা হইয়া গেল। তাঁহার দোলা-পীড়িত হৃদয় আশ্রয় পাইয়া আজ যেন চারিদিক হইতে আবার তাঁহার অভিনন্দন করিতে আরম্ভ করিল। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, অঙ্কুশাহতচিত্তে মনকে দ্বিধা করিবার অবকাশ মাত্র না দিয়া এক নিশ্বাসে অন্তঃপুরের ভিতর প্রবেশ করিয়া একেবারে জননীর সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

আনন্দময়ী নীচের বারান্দার এক পার্শ্বে বসিয়া স্বামীর রাত্রের কথাগুলা মনে মনে আলোচনা করিতেছিলেন,—শশি-মুখীকে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া তিনি কন্যার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিলেন। কন্যার মুখ চোখের ভাব দেখিয়া যেন একটু ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন। কন্যাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহার সাহস হইল না। নীরবে বেশ একটু বিস্মিত ভাবে কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। শশিমুখী সুস্পষ্ট শান্তস্বরে বলিলেন, "মা আমি আজই শ্বশুরবাড়ী যাব। তুমি আমায় এখনি পাঠিয়ে দাও।"

আনন্দময়ী কন্যার মুখচোখের ভাব দেখিয়াই একটু চঞ্চল হইয়াছিলেন তাহার উপর এই অপ্রত্যাশিত কথা শুনিয়া তিনি একেবারে বিচলিত হইয়া পড়িলেন। স্বামী একটু পূর্ব্বে কন্যাকে বাহিরে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন,—তবে কি তিনি এমন কিছু বলিয়াছেন যাহাতে কন্যা হৃদয়ে ব্যথা পাইয়াছে! তাঁহার মুখের কোনই আটঘাট নাই,—কখন কাহাকে কি বলেন, তাহার কোনই ঠিক্ ঠিকানা নাই। তিনি কিছুই ভালো বুঝিতে না পারিয়া বিহ্বলের ন্যায় বলিলেন, "কেন,—কি হয়েছেরে,—তোর বাবা কি কিছু বলেছেন নাকি?"

শশিমুখী চুপ করিয়া রহিলেন,—মায়ের কথার কোনই উত্তর দিলেন না। কন্যাকে নীরব দেখিয়া আনন্দময়ী স্থির বুঝিলেন, নিশ্চয়ই তাঁহার স্বামী এমন কোন কথাব লিয়াছেন যাহাতে তাঁহার

কন্যা প্রাণে ব্যথা পাইয়াছে। তিনি তাড়াতাড়ি কন্যাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য সকরুণ স্নেহে আবার কহিলেন- "চুপ ক'রে রইলি কেন! বাপের কথায় কি রাগ কর্ত্তে আছে, ওঁর ওই রকমই কথার ধারা। আমি ওঁকে বুঝিয়ে দু'একদিনের মধ্যেই তোকে শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দেব।"

ভগবান শশিমুখীকে যে স্বভাবটা দিয়াছিলেন,—তাহাতে লোকের কথার কোন আঁচড়ই পড়িত না। তিনি নিজে যাহা ভালো বুঝিতেন, তাহা হইতে একপদও বিচলিত হইতেন না। দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "না মা, আমি আজই যাব। তোমরা যদি পাঠিয়ে না দাও, আমি নিজে গাড়ী ডেকে চ'লে যাব।"

আনন্দময়ী কন্যার স্বভাব ভাল রূপই জানিতেন,—সে যখন একবার জেদ ধরিয়াছে, তখন আর তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিবার উপায় নাই, তিনি শান্তস্বরে বলিলেন, "মেয়ে শ্বশুরবাড়ী যাবে তাতে কি আর মায়ের আপত্তি হয় রে। মেয়েকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাতে সব মায়েরই প্রাণ আনন্দে ভরে উঠে। কিন্তু জানিস তো; তোর বাপের স্বভাবটিতো তেমন নয়, এখনি হয়তো রেগে মেগে একসা করবেন। তাঁকে একটু বুঝিয়ে সুজিয়ে আমি তোকে শিগ্‌গীরই পাঠাইয়ে দেব।"

মায়ের কথায় প্রতিবন্ধক দিয়া শশিমুখী আবার কি বলিতে যাইতেছিলেন,—পিতাকে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া নীরব হইলেন।

অপূর্ব্বের তাড়াইবার বিবরণটা কন্যাকে দিবার জন্যই একগাল

হাসি লইয়া ভোলানাথ দত্ত ভিতরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কন্যা ও পত্নীকে সম্মুখে পাইয়াই তিনি সেই কথাটায় বেশ একটু অলঙ্কার দিয়া আরম্ভ করিলেন, "ওরে শশি, তোর ভাসুর যে তোকে নিতে এসেছিল। কাল তোর ভাসুরঝির গায়েহ'লুদ। বাছাধনকে এমনি শোনান্ শুনিয়েছি যে, মুখটী একেবারে এতটুকু হ'য়ে গেছে। মুখ দিয়ে আর একটা কথা পর্য্যন্ত বার হলো না,—আস্তে আস্তে সটান বেরিয়ে যেতে পথ পেলে না।"

স্বামীর কথায় আনন্দময়ীর সমস্ত দেহটা যেন একেবারে ধিক্কার দিয়া উঠিল, তিনি গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শশীর ভাসুর এসেছিল'—আর তুমি তাকে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিলে।"

দত্ত মহাশয় বিকৃত কণ্ঠে বলিলেন, "হা গো হা! তুমি কি ভেবেছিলে তাকে আমি নেমন্তন্ন ক'রে খাওয়াব।"

আনন্দময়ী বিশেষ বিরক্তস্বরে বলিলেন, "তোমার যা ইচ্ছে করগে যাও,—তুমিতো আর কারুর কথার মানুষ নও। কুটুম্ব ব'লেই যদি নাই ধর,—বাড়ীতে একটা ভদ্রলোক এলেও তো তার লোকে যত্ন খাতির করে। মেয়ের বিয়ে দিয়ে কি আর অত তেজ করা চলে! জামায়ের ভাই,—তাকে কিনা অপমান ক'রে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে। তোমার জ্বালায় কি শেষ আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরবো।"

দ্রুতগামী বাষ্পীয় শকট সহসা সজোরে কোথাও ধাক্কা খাইলে সে যেমন একেবারে খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া উঠে,—ভোলানাথ দত্তও তাঁহার আস্ফালনের মুখে এই প্রতিবন্ধক পাইয়া

একেবারে চোখ মুখ লাল করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "খবরদার,—তুমি আমার মেয়ের সম্বন্ধে কোন কথা কয়ো না। তোমার মত মেয়ে মানুষের গলায় দড়ি দিয়ে মরাই ভালো। মেয়ে মানুষের স্বভাব যাবে কোথায়,—নিজের মেয়েকে এক মুঠা ভাত দিতে বুক একেবারে করকর ক'রে উঠে,—না? মেয়ে শ্বশুরবাড়ীতে মরে যাক্,—হেজে যাক্ কিছু দেখবার দরকার নেই,—আমার শুধু খরচ কমুক। ও সব ছোটলোকমী আমার কাছে চলবে না।"

স্বামীর মুখে এত বড় অপবাদটা আনন্দময়ী আর সহ্য করিতে পারিলেন না। অভিমানে দর দর করিয়া দুই নয়ন বহিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। ধিক্কারে ঘৃণায় তাঁহার মরিতে ইচ্ছা হইতেছিল, তিনি সেই অশ্রু-জড়িত করুণ কণ্ঠে বলিলেন, "আমি আর কোন দিন কোন কথা বলবো না,—আমার বলবার দরকার কি! এই তোমার মেয়ে আছে, আর তুমি আছ—দু'জনে বোঝা পড়া কর। তোমার মেয়ে এখনি শ্বশুরবাড়ী চ'লে যেতে চায়। তোমার এমনি আচরণ যে তোমার নিজের মেয়েও তোমার কাছে থাক্‌তে চায় না।"

ভোলানাথ দত্ত রাগিয়া ফাটিবার মত হইলেন,—তিনি মুখ-খানা বিকৃত করিয়া এক অদ্ভুত কণ্ঠে বলিলেন, "হাঁ,—সে তোমার কাণে ধ'রে সেই কথা বলেছে। আমার মেয়ে, তার তো আর তোমার মত ছোট নজর নয়।"

শশিমুখী এতক্ষণ প্রাচীরে ঠেস দিয়া নির্ব্বাক হইয়া মাতা ও পিতার এই রুক্ষ কথাবার্ত্তা গুলো শুনিতেছিলেন। একটা প্রবল ঝটিকা প্রাণের ভিতর প্রবাহিত হইয়া তাঁহাকে একেবারে স্তব্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু তাঁহারই জন্য পিতার নিকট মাতার এই অপমান, তাঁহার নীরবে আর সহ্য করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। তিনি প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে দৃঢ় করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। পিতা নীরব হইবামাত্র অতি স্পষ্ট স্বরে বলিলেন, "না বাবা আমি আর এখানে থাক্‌বো না,—আমায় আজিই তুমি শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দাও।"

গাঢ় নিদ্রার মাঝে ভূমিকম্পে সমস্ত মেদিনী থরথর প্রকম্পিত হইলে মানুষ যে ভাবে জাগিয়া উঠে, দত্ত মহাশয়, ঠিক সেইভাবে কন্যার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। একটা বক্র দৃষ্টিতে কন্যার দিকে চাহিয়া উগ্রস্বরে বলিলেন, "পাঠিয়ে দাও বল্লেই তো আর পাঠিয়ে দেওয়া হবে না। তোমার মা'টি দেখছি তোমারও মাথাটি খেয়েছেন। আমার উচু মাথাটা নীচু ক'রে দেবার এ সব ষড়যন্ত্র আমি ঢের বুঝি। আমি কিছুতেই পাঠাব না,—দেখি কি ক'রে তোমার মায়ের পরামর্শটা চলে।"

পিতার এই ক্রুদ্ধ স্বরে শশিমুখীর হৃদয়টা একেবারে উদ্বেলিত হইয়া পড়িল। বাধা পাইয়া তিনি যেন আরোও উত্তেজিত হইয়া পড়িলেন, দৃঢ় স্বরে বলিলেন, "যে বাড়ীতে আমার ভাসুরের অপমান হয়, সেখানে আমি কিছুতেই থাকৃব না।"

কন্যার এই অবিচলিত উত্তরে ভোলানাথ দত্তের মুখ-চোখ একেবারে লাল হইয়া গেল। ক্রোধের ধমকে তাঁহার যেন দম বন্ধ হইবার মত হইল। তিনি একবার তীব্র দৃষ্টিতে কন্যার পানে চাহিয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন। আনন্দময়ী এতক্ষণ নীরবে বসিয়া চ'খের জলে ভাসিতে ছিলেন। স্বামী চলিয়া যাইবার পর কন্যার দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "আর কি তোকে তাঁরা ঘরে নেবেন। মেয়ের বাপ, জামায়ের ভাইকে এমন ক'রে অপমান করে তাড়ালে কেউ কখন কি আর বৌয়ের মুখ দেখে! এখন বাপের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে এ-পথ ও-পথ দু'পথই আর বন্ধ করিস নি। যা তোর বাবাকে একটু শান্ত ক'রে আয়। যে রাগী মানুষ এখনি হয়তো কি করে বস্‌বে।"

শশিমুখী মায়ের কথায় বাধা দিয়া বলিল, "না মা আর আমি বাবার কাছে যাব না। স্থান দিন্ আর না দিন্ তবু আমি শ্বশুর-বাড়ীই যাব। সবাই আমায় ফেলতে পারলেও,—আমি জানি আমার জা' আমায় কিছুতেই ফেলতে পারবেন না।"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রত্যুষ হইতেই বাটীর বাহিরে রোসুনচৌকি থাকিয়া থাকিয়া মিলনের মঙ্গল-বাদ্য বাজাইতেছিল। আজ শান্তির গাত্র হরিদ্রা। অনুপম তাঁহার একমাত্র ভাইঝির বিবাহে আনন্দ উৎসব, ধুম ধাম কিছুরই ত্রুটি রাখেন নাই। প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাড়ীখানি আজ যেন এক মহা আনন্দের ভিতর দিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। আনন্দ যেন আজ মহা আনন্দে মিশিয়া গিয়া বাটীর প্রতি কক্ষে লুকোচুরি খেলিতেছে। প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে নিকট আত্মীয় ললনাগণ একে একে আসিয়া উপস্থিত হইতেছিলেন,—চারিদিকে হট্টগোলে ও হাসির রোলে বিবাহ ক্রমেই জমিয়া উঠিতেছিল।

কিন্তু এত আনন্দেও সরোজবাসিনীর মনে সম্পূর্ণ সুখ ছিল না। একটা কিসের বেদনা হৃদয়ের যবনিকার ভিতর হইতে থাকিয়া থাকিয়া উঁকি মারিতেছিল। তিনি রান্নাঘরে আন্‌মনে চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন,—সেই সময় সানা'য়ে আবার সুর ধরিল। সেই রাগিণীর আঘাতে তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত অন্ধকার স্পন্দিত হইয়া যেন কাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। যাহার অভাবে সরোজ-বাসিনীর সমস্ত প্রাণটা একেবারে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল,—সে যে আর আসিবে না,—সে যে এ উৎসবের ভাগ লইবে না,

তাঁহা সরোজবাসিনী জানিতেন্। শশিমুখী রাগ করিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া যাইবার পরও সরোজবাসিনী ভাবিয়াছিলেন, একটু রাগ পড়িলেই ছোটবৌ ফিরিয়া আসিবে; কিন্তু যে দিন স্বামী ভোলানাথ দত্তের নিকট অপমানিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন, সেই দিন হইতেই তাঁহার সমস্ত আশা একেবারে নিরাশার ভিতর ডুবিয়া গিয়াছে। এই মধুর রাগিণী কর্ণে প্রবেশ করিয়া বহুদিনের সেই পুরাণো কথা সানাইয়ের ছোটবৌয়ের বিবাহ রাত্রির প্রত্যেক ক্ষুদ্র ঘটনাটীও আবার নূতন করিয়া সরোজ-বাসিনীর হৃদয়ের উপর ভাসিয়া উঠিয়া সমস্ত প্রাণটাকে আন্দোলিত করিতে লাগিল। সে দিনকার আলোক, কোলাহল, জনতা,—সে দিনকার সেই লজ্জিত, শঙ্কিত নববধূর সেই সুন্দর মুখখানি স্মৃতির আকারে যতই তাঁহাকে চারিদিক হইতে আবিষ্ট করিয়া ধরিতেছিল, ততই তাঁহার হৃদয়ের ব্যথা যেন সজীব হইয়া উঠিতেছিল। দারুণ দুর্ভিক্ষে ক্ষুধিত-বালক যেমন খাদ্যের জন্য মাতাকে আঘাত করিতে থাকে, তেমনি করিয়া ছোট বৌয়ের অভাবটা সরোজবাসিনীর বক্ষে বারংবার সরোদনে আঘাত করিতে লাগিল।

এখনি হয়তো একবাড়ী আত্মীয় কুটুম্ব ললনাদিগের মধ্যে ছোটবৌয়ের না আসিবার কারণটা উত্থিত হইবে। যখন তাঁহারা আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, ছোটবৌ আসিল না কেন,—তখন তিনি কি উত্তর দিবেন! কেমন করিয়া প্রকাশ

করিবেন যে তাঁহারই সহিত ঝগড়া করিয়া ছোটবৌ পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছে। দুঃখে ক্ষোভে সরোজবাসিনীর চক্ষে জল আসিতেছিল। আজ তাঁহার সমস্ত প্রাণটা আলোড়িত করিয়া যে তুফান বহিতেছিল তাহা কেবল অন্তর্য্যামী ভিন্ন অপরের জানিবার ক্ষমতা নাই। এই মঙ্গল অধিষ্ঠানে,—কেবল কন্যার অমঙ্গলের আশঙ্কায় তিনি জোর করিয়া অশ্রু দমন রাখিয়াছিলেন। রান্নাঘরে এমন করিয়া একলাটী চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে তাঁহার যেন লজ্জা বোধ হইতে লাগিল,—তিনি এই বিবাহের কর্ম্ম-কোলাহলের ভিতর নিজেকে মগ্ন করিয়া দিবার জন্য ধীরে ধীরে রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

উঠানে তখন বড় বড় বঁটিতে রোহিত মৎস্য কুটিবার ধূম পড়িয়া গিয়াছিল। অনুপম তাহারই তদ্‌বির করিতেছিলেন। বৌদিকে রান্নাঘর হইতে বাহির হইতে দেখিয়া, তিনি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। তাঁহার মেঘাচ্ছন্ন মুখখানির প্রতি চাহিয়া অনুপম যেন একটু বিচলিত হইয়া পড়িলেন। সরোজবাসিনী নিকটে আসিবা মাত্র তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বৌদি তোমার মুখখানা আজ এমন শুক্‌নো কেন। মেয়ের বিয়ে—কোথায় কোমর বেঁধে স্ফূর্ত্তি করবে, তা নয় মুখখানি চুণ করে আছ।"

দেবরের কথায় সরোজবাসিনী একটু মৃদু হাসিলেন, বিষাদ স্বরে বলিলেন, "আমার শান্তির বিয়েতে ছোটবৌ এল না—একি আমার কম দুঃখ ঠাকুরপো।"

তড়িত যেমন মনুষ্যের দেহে প্রবেশ করিলে, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দেহটা একেবারে কাঁপিয়া উঠে, বৌদিদির কথায় অনুপমের ভিতরটা ঠিক সেইভাবে কাঁপিয়া উঠিল, তিনি কোন প্রকার উত্তর না দিয়া সটান বাহিরের দিকে চলিয়া গেলেন। দেবরের এই নীরব উত্তরের ভিতর কত বড় ব্যথা লুক্কাইত ছিল সরোজবাসিনী তাহা বুঝিতে পারিলেন। এই আনন্দের দিনে পত্নী না আসায় দেবরের যে কত বড় দুঃখ, তাহা অন্যে না বুঝিলেও তিনি বুঝিলেন। একটা গাঢ় দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ভাঁড়ার-ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

অন্নপূর্ণা প্রত্যুষে আসিয়াই উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি একজন মস্ত পাকা গিন্নী, তাই অপূর্ব্ব তাঁহাকেই ভাঁড়ারের জিম্মায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি ভাঁড়ারের ভিতর বসিয়া মাঝে মাঝে নাক সিটকাইয়া কয়েকজন ললনার সম্মুখে হাত নাড়িয়া নাড়িয়া, কত বড় বড় বিবাহে, কত বড় বড় ভাঁড়ারের জিম্মায় থাকিয়া কেমন করিয়া জিনিষ পত্রের অপচয় নিবারণ করিয়াছিলেন তাহারই ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। সরোজবাসিনীকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া ঘাড় তুলিয়া নাক সিটকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ বৌ, তোমাদের ছোটবৌ এখনও এলো না? তোমাদের বাপু ছোট বৌটির একেবারেই আক্কেল নেই। কাজের বাড়ী, কোথায় সকাল সকাল আস্‌বে,—তা না—তার আর বার হয় না।"

অন্নপূর্ণা গৃহে পদার্পণ করিয়াই ছোট বৌয়ের সন্ধান লইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট কথাটা প্রকাশ হইলে,—তাহা যে

জানিতে আর কাহারও বাকি থাকিবে না, তাহা সরোজবাসিনীর নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল না; সেই ভয়ে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে তাঁহার নিকট মিথ্যা কথা বলিতে হইয়াছিল যে, ছোটবৌ এখনি আসিবে। আরোও কয়েকজন বাহিরের ললনা তথায় বসিয়াছিল,—অন্নপূর্ণার কথায় সরোজবাসিনী মুস্কিলে পড়িলেন;—সহসা কথাটার কোন উত্তর দিতে না পারিয়া তিনি যেন হাঁপাইয়া উঠিলেন। সরোজবাসিনীকে থতমত খাইতে দেখিয়া অন্নপূর্ণা আবার বেশ একটু জুৎ করিয়া আরম্ভ করিবার চেষ্টায় ছিলেন, সেই সময় উঠানে অপূর্ব্বের কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল, "ওগো বেরিয়ে এস না, ছোটবৌমা এসেছেন?"

স্বামীর কণ্ঠস্বর কর্ণে যাওয়ায় সরোজবাসিনী যেন স্বপ্নের ভিতর হইতে জাগিয়া উঠিলেন। কথাটা তাঁহার বিশ্বাস হইল না,—তিনি তাড়াতাড়ি ভাঁড়ারের ভিতর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। বুকে তখন তাঁহার প্রবল স্পন্দন। ভাঁড়ার হইতে উঠানে বাহির হইয়া সম্মুখে তিনি যাহা দেখিলেন,—তাহাতে কে যেন তাঁহাকে আনন্দ সমুদ্রের ভিতর একবারেই ডুবাইয়া দিল। তিনি দেখিলেন, বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া, অবগুণ্ঠনে বদন ঢাকিয়া উঠানের মধ্যস্থলে আসিয়া সত্যই ছোটবৌ দাঁড়াইয়াছে। অপূর্ব্ব ছোটবৌমাকে বাটীর ভিতর পৌঁছাইয়া দিতে আসিয়াছিলেন, পত্নীকে দেখিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "ছোটবৌমা বাপের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে ঝিয়ের সঙ্গে একলাই চ'লে এসেছেন। শান্তির বিয়ে তাঁর যে নিজের কাজ, তিনি কি, না এসে থাকতে পারেন?"